এঙ্গেলস

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

প্রগতি প্রকাশন • মস্কো

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়। আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

Художественный редактор *В. Колганов*
Технический редактор *З. Кондрашова*

Подписано к печати 9/VI-1975 г. Формат 84×108/32.
Бум. л. 1¾. Печ. л. 4,62.
Уч.-изд. л. 6,51. Изд. № 19597. Заказ 1048.
Цена 20 к. Тираж 20500.

Издательство «Прогресс»
Государственного Комитета
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21.

Ордена Трудового Красного Знамени
Московская типография № 7 «Искра революции»
«Союзполиграфпрома» при Государственном
Комитете Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Г-19, пер. Аксакова, 13.

সূচি

১৮৯২ সালের ইংরাজি সংস্করণের বিশেষ ভূমিকা (১)

বর্তমানের এই ছোট পুস্তিকাটি মূলত একটি বৃহত্তর রচনার অংশ। ১৮৭৫ সালের কাছাকাছি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের privatdocent ডঃ ইয়ে. দ্যুরিং সহসা এবং খানিকটা সরবে সমাজতন্ত্রে তাঁর দীক্ষাগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন ও জার্মান জনসাধারণের কাছে একটা বিস্তারিত সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বই শুধু নয়, সমাজ পুনর্গঠনের গোটা একটা ব্যবহারিক ছকও হাজির করেন। বলাই বাহুল্য, উনি তাঁর পূর্ববর্তীদের সঙ্গে কলহ করেছেন; সর্বোপরি তাঁর পুরো ঝাল ঝেড়ে সম্মানিত করেছেন মার্কসকে।

ঘটনাটা ঘটে প্রায় সেই সময় যখন জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির দুটি অংশ, আইজেনাখীয় ও লাসালীয়রা (২) সবে মিলিত হয়েছে এবং তাতে করে প্রভূত শক্তি বৃদ্ধি করেছে তাই নয়, অধিকন্তু এই সমগ্র শক্তিটা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োগের ক্ষমতাও অর্জন করেছে। জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টি দ্রুত একটা শক্তি হয়ে উঠছিল। কিন্তু শক্তি হয়ে ওঠার প্রথম সর্তই ছিল, এই নবার্জিত ঐক্যকে বিপন্ন করা চলবে না। ডঃ দ্যুরিং কিন্তু প্রকাশ্যেই তাঁর চারিপাশে একটি জোট পাকাতে শুরু করেন, একটি ভবিষ্যৎ পৃথক পার্টির তা বীজ। সুতরাং প্রয়োজন হয় দ্বন্দ্বাহ্বান গ্রহণ করে লড়ে যাওয়া, চাই বা না চাই।

কাজটা অতি দুষ্কর না হলেও স্পষ্টতই এক দীর্ঘ ঝামেলার ব্যাপার। এ কথা সুবিদিত যে, আমরা জার্মানরা হলাম সাঙ্ঘাতিক রকমের গুরুভার Gründlichkeit-এর ভক্ত — তাকে র‍্যাডিক্যাল প্রগাঢ়ত্ব অথবা প্রগাঢ় র‍্যাডিক্যালত্ব যা খুশি বলুন। আমাদের কেউ যখন তাঁর বিবেচনানুসারে যা নতুন মনে হচ্ছে এমন একটি মতবাদ বিবৃত করতে চান, তখন সর্বাগ্রে সেটিকে একটি সর্বাঙ্গীণ মতধারায় পরিপ্রসারিত করতে হবে তাঁকে। প্রমাণ করে দিতে হবে যে, ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম সূত্রটি থেকে বিশ্বের মৌলিক নিয়মগুলি সবই আর কিছুই না, অনাদি কাল থেকে শুধু এই নবাবিষ্কৃত মুকুটমণি তত্ত্বটিতে পৌঁছনোর জন্যই বিদ্যমান। এবং এদিক থেকে ডঃ দ্যুরিং একান্তই জাতীয়

মানোত্তীর্ণ। একছিটে কম নয় একেবারে সুসম্পূর্ণ একটা 'দর্শন-ব্যবস্থা' — মনোজাগতিক, নৈতিক, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক; সুসম্পূর্ণ একটা 'অর্থশাস্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা'; এবং পরিশেষে 'অর্থশাস্ত্রের বিচারমূলক ইতিহাস' — অক্টাভো সাইজের তিনটি মোটা মোটা খণ্ড, আকার ও প্রকার উভয়তই গুরুভার, সাধারণভাবে পূর্বতন সমস্ত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে মার্কসের বিরুদ্ধে তিন অক্ষৌহিণী যুক্তি, মোটকথা একটা পরিপূর্ণ 'বিজ্ঞান বিপ্লবের' প্রচেষ্টা, এরই মোকাবিলা করতে হত। আলোচনা করতে হত সম্ভাব্য সবকিছু প্রসঙ্গ: স্থান কালের ধারণা থেকে Bimetallism (৩) পর্যন্ত; বস্তু ও গতির চিরন্তনতা থেকে শুরু করে নৈতিক ভাবনার মরণশীল প্রকৃতি; ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে ভবিষ্যৎ সমাজে তরুণদের শিক্ষা — সব। যাই হোক, আমার প্রতিপক্ষের প্রণালীবদ্ধ সর্বাঙ্গীণতার ফলে এই অতি বিভিন্ন সব প্রসঙ্গে মার্কস ও আমার যা মতামত সেগুলিকে দ্যুরিং-এর বিপরীতে, এবং এযাবৎ যা করা হয়েছে তার চেয়ে আরো সুসম্বদ্ধ আকারে বিকশিত করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। অন্যথায় অকৃতার্থ এ কর্তব্যগ্রহণে সেই ছিল আমার প্রধান কারণ।

আমার জবাব প্রথমে প্রকাশিত হয় সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রধান মুখপত্র লাইপজিগ Vorwärts* পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ হিশেবে এবং পরে 'Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft' (শ্রী ইয়ে. দ্যুরিং-এর 'বিজ্ঞান বিপ্লব') নামক পুস্তকাকারে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুরিখে ১৮৮৬ সালে।

সুহৃদর এবং অধুনা ফরাসী প্রতিনিধি সভায় লিল্ প্রতিনিধি পল লাফার্গের অনুরোধে এ বইয়ের তিনটি পরিচ্ছেদ একটি পুস্তিকাকারে সাজিয়ে দিই। তিনি তা অনুবাদ করে ১৮৮০ সালে 'Socialisme utopique et Socialisme scientifique' ('ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র') নামে প্রকাশ করেন। এই ফরাসী পাঠ থেকে একটি পোলীয় ও একটি স্পেনীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালে আমাদের জার্মান বন্ধুরা পুস্তিকাটিকে মূল ভাষায় প্রকাশ করেন। জার্মান পাঠের ওপর ভিত্তি করে ইতালীয়, রুশ, দিনেমার, ওলন্দাজ, রুমানীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাই বর্তমান ইংরাজি

* Vorwärts — গোথা ঐক্য কংগ্রেসের পর জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির মুখপত্র। প্রকাশিত হয় লাইপজিগ থেকে ১৮৭৬—১৮৭৮ সালে। — সম্পাঃ

সংস্করণটি ধরলে পুস্তিকাটি দশটি ভাষায় প্রচারিত। আর কোনো সমাজতান্ত্রিক পুস্তক, এমনকি আমাদের ১৮৪৮ সালের 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' বা মার্কসের 'পুঁজি' বইটিও এত ঘন ঘন অনুবাদ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। জার্মানিতে এ বইটির চারটি সংস্করণ হয়েছে, সর্বসমেত ২০,০০০ কপি।

'মার্ক' (৪), এই সংযোজনী লেখা হয়েছিল জার্মানিতে ভূমি সম্পত্তির ইতিহাস ও বিকাশের কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। এটা তখন আরো বেশি প্রয়োজনীয় কারণ সে পার্টিতে শহুরে মজুরদের অঙ্গীভবন তখন বেশ সম্পূর্ণতার দিকে, পালা এসেছে ক্ষেতমজুর ও চাষীদের। অনুবাদে এ সংযোজনী রেখে দেওয়া হয়েছে, কেননা সমস্ত টিউটোনিক জাতির পক্ষে যা একই সেই ভূমি-ব্যবস্থার আদি ধরনটা এবং তার অবক্ষয়ের ইতিহাস জার্মানির চেয়েও ইংলন্ডে কম সুবিদিত। লেখাটি মূলে যা ছিল তাই রেখে দিয়েছি, মাক্সিম কভালেভস্কি সম্প্রতি যে প্রকল্প দিয়েছেন তার কথা উল্লেখ করা হয় নি; এই প্রকল্প অনুসারে মার্ক-এর সভ্যদের মধ্যে আবাদী ও চারণভূমির ভাগাভাগি হয়ে যাবার আগে এগুলির চাষ হত যৌথ হিশেবে বেশ কয়েক পুরুষের এক একটি বৃহৎ পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক গোষ্ঠী দ্বারা (অদ্যাবধি বর্তমান দক্ষিণ স্লাভোনীয় জাদ্রুগা তার দৃষ্টান্ত), ভাগাভাগি হয় পরে, যখন গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেয়ে যৌথ হিশেবে পরিচালনার পক্ষে বড়ো বেশি বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়। কভালেভস্কির বক্তব্য হয়ত ঠিকই, কিন্তু বিষয়টা এখনো sub judice*।

এ বইয়ে ব্যবহৃত অর্থনৈতিক পরিভাষার মধ্যে যেগুলি নতুন সেগুলি মার্কসের 'পুঁজি' বইটির ইংরাজি সংস্করণ অনুযায়ী। সেই অর্থনৈতিক পর্যায়কে আমরা 'পণ্যোৎপাদন' বলছি যেখানে সামগ্রী উৎপাদন করা হচ্ছে কেবল উৎপাদকের ভোগের জন্য শুধু নয়, বিনিময়ের জন্যও; অর্থাৎ ব্যবহার-মূল্য হিশেবে নয়, **পণ্য হিশেবে**। বিনিময়ের জন্য উৎপাদনের প্রথম সূত্রপাত থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত এই পর্যায়টা প্রসারিত; তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদনেই, অর্থাৎ সেই অবস্থায়, যখন উৎপাদন-উপায়ের মালিক পুঁজিপতি মজুরি দিয়ে নিয়োগ করে শ্রমিকদের, শ্রমশক্তি ছাড়া যারা উৎপাদনের সর্ববিধ উপায় থেকে বঞ্চিত তাদের, এবং সামগ্রীর বিক্রয়-মূল্য

* Sub judice —বিচারসাপেক্ষ। — সম্পাঃ

থেকে তার লগ্নির ওপর যেটা উদ্বৃত্ত হয় সেটি পকেটস্থ করে। মধ্য যুগ থেকে শুরু করে শিল্পোৎপাদনের ইতিহাসকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করি: ১) হস্তশিল্প, ক্ষুদে ক্ষুদে ওস্তাদ কারুশিল্পী ও জনকয়েক ঠিকা মজুর ও সাকরেদ, প্রত্যেক শ্রমিকই সেখানে পুরো সামগ্রীটাই তৈরি করে; ২) হস্তশিল্প কারখানা (manufacture), যেখানে অধিকতর সংখ্যক শ্রমিক একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে একত্র হয়ে সম্পূর্ণ সামগ্রীটা উৎপাদন করে শ্রমবিভাগ নীতিতে, প্রত্যেকটা শ্রমিক করে শুধু এক একটা আংশিক কাজ যাতে সামগ্রীটা সম্পূর্ণ হয় শুধু পর পর সবার হাত ফেরতা হয়ে যাবার পর; ৩) আধুনিক যন্ত্রশিল্প, যেখানে মাল তৈরি হয় শক্তি-চালিত যন্ত্র দ্বারা আর শ্রমিকের কাজ শুধু যন্ত্রের ক্রিয়ার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ।

আমি বেশ জানি যে, এ বইয়ের বিষয়বস্তুতে বৃটিশ পাঠক সাধারণের একটা বড়ো অংশের আপত্তি হবে। কিন্তু আমরা, মূল ইউরোপ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা যদি বৃটিশ 'শালীনতা' রূপ কুসংস্কারের বিন্দুমাত্র ধারও ধারতাম, তাহলে আমাদের অবস্থা যা আছে তা আরো শোচনীয় হত। আমরা যাকে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বলি, এ বইয়ে তাকেই সমর্থন করা হয়েছে আর 'বস্তুবাদ' শব্দটাই বৃটিশ পাঠকদের বিপুল অধিকাংশের কানে বড়ো বেঁধে। 'অজ্ঞেয়বাদ' (৫) তবু সহনীয়, কিন্তু বস্তুবাদ একেবারেই অমার্জনীয়।

অথচ সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে আধুনিক সমস্ত বস্তুবাদেরই আদি ভূমি হল ইংলন্ড।

'বস্তুবাদ গ্রেট বৃটেনের আত্মজ সন্তান। বৃটিশ স্কুলম্যান (৬) দুনস স্কোট তো আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'বস্তুর পক্ষে ভাবনা কি অসম্ভব?'

এই অঘটন-ঘটনের জন্য তিনি আশ্রয় নেন ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তায় অর্থাৎ তিনি ধর্মতত্ত্বকে (৭) লাগান বস্তুবাদের প্রচারে। তদুপরি তিনি ছিলেন নামবাদী। নামবাদ (৮), বস্তুবাদের প্রাথমিক এই রূপ প্রধানত দেখা যায় ইংরেজ স্কুলম্যানদের মধ্যে।

'ইংরাজি বস্তুবাদের আসল জনক হলেন বেকন। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক দর্শনই হল একমাত্র সত্য দর্শন এবং ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করা পদার্থবিদ্যা হল প্রাকৃতিক দর্শনের প্রধান ভাগ। আনাক্সেইগরস এবং তাঁর homoiomereia (৯), ডিমোক্রিটস এবং তাঁর পরমাণুর কথা তিনি প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন তাঁর প্রামাণ্য হিশেবে। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয় অভ্রান্ত ও সর্বজ্ঞানের উৎস। সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়-দত্ত তথ্যকে

যুক্তিসম্মত প্রণালীতে বিচার করাই হল বিজ্ঞানের কাজ। অনুমান, বিশ্লেষণ, তুলনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা হল এই ধরনের যুক্তিসম্মত প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল গতি, যান্ত্রিক ও গাণিতিক গতিই শুধু নয়, প্রধানত একটা উদ্বেগ (impulse), একটা সজীব প্রেরণা, একটা টান, অথবা ইয়াকব ব্যোমের কথা অনুসারে— বস্তুর একটা বেদনা (qual)*।

'বস্তুবাদের প্রথম স্রষ্টা বেকনের মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বীজ তখনো অন্তর্নিহিত। একদিকে ইন্দ্রিয়গত কাব্যময় ঝলকে পরিবৃত বস্তু যেন মানবের সমগ্র সত্তাকে আকৃষ্ট করছে মোহিনী হাসি হেসে। অন্যদিকে সূত্রোক্তি রূপে নিবদ্ধ মতবাদ ধর্মতত্ত্ব থেকে আমদানি করা অসঙ্গতিতে পল্লবিত।

'পরবর্তী বিকাশে বস্তুবাদ হয়ে ওঠে একপেশে। বেকনীয় বস্তুবাদকে যিনি গুছিয়ে তোলেন তিনি হব্স। ইন্দ্রিয়ভিত্তিক জ্ঞান তার কাব্য মায়া হারিয়ে গাণিতিকের বিমূর্ত অভিজ্ঞতার করায়ত্ত হল; বিজ্ঞানের রাণী বলে ঘোষণা করা হল জ্যামিতিকে। বস্তুবাদ আশ্রয় নিল মানবদ্বেষে। প্রতিদ্বন্দ্বী মানবদ্বেষী দেহহীন অধ্যাত্মবাদকে যদি তারই স্বভূমিতে পরাস্ত করতে হয়, তাহলে বস্তুবাদকেও তার দেহ দমন করে যোগী হতে হয়। এই ভাবে ইন্দ্রিয়গত সত্তা থেকে তা পরিণত হল বুদ্ধিগত সত্তায়; কিন্তু এ ভাবেও, বুদ্ধির যা বৈশিষ্ট্য সেই অনুসারে, ফলাফলের তোয়াক্কা না করে সবকটি সঙ্গতিকেই তা বিকশিত করে তোলে।

'বেকনের অনুবর্তক হব্স এই যুক্তি দেন: সমস্ত মানবিক জ্ঞান যদি পাই ইন্দ্রিয় থেকে তাহলে আমাদের ধ্যানের ধারণা ও ভাবনাগুলি বাস্তব জগতের ইন্দ্রিয়গত রূপ বর্জিত ছায়ামূর্তি ছাড়া কিছু নয়। দর্শন শুধু এই ছায়ামূর্তিদের নামকরণ করতে পারে। একই নাম প্রযুক্ত হতে পারে একাধিক ছায়ামূর্তিতে। এমনকি নামেরও নাম থাকতে পারে। স্ববিরোধ

---

* Qual — দার্শনিক কথার খেলা। Qual কথার আক্ষরিক অর্থ যন্ত্রণা, একটা বেদনা যা থেকে কোনো ধরনের কর্মে ঠেলে দেয়। এই জার্মান শব্দটির মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদী ব্যোমে ল্যাটিন qualitas-এর (গুণ) কিছুটা অর্থও আরোপ করেছেন। বাইরে থেকে দেওয়া যন্ত্রণার বিপরীতে তাঁর qual হল বেদনার্ত বস্তু, সম্পর্ক বা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ থেকে উদ্ভূত ও সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকাশকে অগ্রসর করার মতো এক সক্রিয়কারিকা। (ইংরাজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

হবে যদি আমরা একদিকে বলি যে, সমস্ত ধারণার উদ্ভব ইন্দ্রিয়ের জগত থেকে এবং অন্যদিকে বলি, সেকথাটার অতিরিক্ত কিছু, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত যে সত্তাগুলি সকলেই এক একটি একক, সেগুলি ছাড়াও একক নয় সাধারণ চরিত্রের সত্তা বর্তমান। দেহহীন বস্তুর মতোই দেহহীন সত্তাও আজগুবি। দেহ, বস্তু, সত্তা হল একই বাস্তবের বিভিন্ন নাম। **চিন্তাশীল বস্তু থেকে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।*** জগতে যে পরিবর্তন চলেছে তা সবের অধঃস্তর হল এই বস্তু। অসীম কথাটা অর্থহীন যদি না বলা হয় যে, অবিরাম যোগ দিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের মনঃশক্তির আছে। কেবল বস্তুময় জগতই আমাদের অনুভবগম্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা আমাদের সম্ভব নয়। একমাত্র আমার নিজস্ব অস্তিত্বই নিশ্চিত। মানবিক প্রতিটি আবেগই হল একটা যান্ত্রিক গতি যার একটা শুরু ও একটা শেষ আছে। যাকে আমরা কল্যাণ বলি তা হল চিত্তাবেগের (impulse) লক্ষ্য। প্রকৃতির মতো মানুষও একই নিয়মের অধীন। ক্ষমতা ও মুক্তি একই কথা।

'হবুস বেকনকে গুছিয়ে তুলেছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জগত থেকে সমস্ত মানবিক জ্ঞানের উদ্ভব, বেকনের এই মূলনীতির কোনো প্রমাণ দাখিল করেন নি। সে প্রমাণ দেন লক তাঁর 'মানবিক বোধ বিষয়ে নিবন্ধ'-এ।

'বেকনীয় বস্তুবাদের আস্তিক্যবাদী (১০) কুসংস্কার চূর্ণ করেছিলেন হবুস। লকের ইন্দ্রিয়বাদের মধ্যে যে ধর্মতত্ত্বের ঝোঁক তখনো থেকে গিয়েছিল তাকে একই ভাবে চূর্ণ করেন কলিন্স, ডডওয়েল, কাউয়ার্ড, হার্টলি, প্রিস্টলি। অন্তত ব্যবহারিক বস্তুবাদীদের পক্ষে ধর্ম থেকে অব্যাহতি পাবার সহজ পদ্ধতি হল Deism (১১)।'**

আধুনিক বস্তুবাদের বৃটিশ উৎস বিষয়ে এই হল মার্কসের লেখা। ইংরেজদের পূর্বপুরুষদের মার্কস যে প্রশংসা করেছিলেন সেটা যদি আজকাল তাদের তেমন রুচিকর না লাগে তবে আক্ষেপেরই কথা। কিন্তু

---

* বড়ো হরফ মার্কসের। — সম্পাঃ

** Marks und Engels, *Die heilige Familie*, Frankfort a M. 1845, S. 201-204. (এঙ্গেলসের টীকা।) (১২)

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বইটির পুরো নাম: Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Konsorten (পবিত্র পরিবার বা বিচারমূলক সমালোচনার সমালোচনা। ব্রুনো বাউয়ের কোম্পানির বিরুদ্ধে)। — সম্পাঃ

অস্বীকার করার জো নেই যে, বেকন, হবুস ও লকই হলেন ফরাসী বস্তুবাদীদের সেই চমৎকার ধারাটির জনক বা, ফরাসীদের ওপর ইংরেজ ও জার্মানরা স্থল ও নৌযুদ্ধে যত জয়লাভই করুক না কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীকে পরিণত করেছে প্রধানত এক ফরাসী শতাব্দীতে এবং সেটা পরিণামের সেই ফরাসী বিপ্লবেরও আগে যার ফলশ্রুতিতে ইংলণ্ড ও জার্মানির আমরা, বাইরের লোকেরা, এখনো অভ্যস্ত হবার জন্য চেষ্টিত।

এ কথা অনস্বীকার্য। এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদগ্ধ যে বিদেশীরা ইংলণ্ডে এসে বাসা পাততেন, তাঁদের প্রত্যেককেই যে জিনিসটা অবাক করেছে সেটাকে তাঁরা 'ভদ্র' ইংরেজ মধ্য শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি ও নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করতে তখন বাধ্য হতেন। আমরা সে সময় সকলেই ছিলাম হয় বস্তুবাদী নয় অন্ততপক্ষে অতি অগ্রণী স্বাধীন-চিন্তক, এবং ইংলণ্ডের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত লোকেই যে যতোরকম অসম্ভাব্য অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করবেন, বাকল্যাণ্ড ও মানটেলের মতো ভূতাত্ত্বিকরাও তাঁদের বিজ্ঞানের তথ্যকে বিকৃত করে বাইবেলের বিশ্বসৃষ্টির অতিকথার সঙ্গে খুব বেশি সংঘর্ষের মধ্যে যেতে চাইবেন না, তা আমাদের কাছে অকল্পনীয় লেগেছিল। অন্যপক্ষে, ধর্মীয় প্রসঙ্গে যাঁরা স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগে সাহসী এমন লোকের সন্ধান পেতে হলে যেতে হত অবিদ্বানদের মধ্যে, তখন যাঁদের বলা হত 'মহা অধৌত' সেই তাঁদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে, বিশেষ করে ওয়েনপন্থী সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে।

কিন্তু অতঃপর ইংলণ্ড 'সুসভ্য' হয়েছে। ১৮৫১ সালের প্রদর্শনী থেকে দ্বীপবদ্ধ ইংরাজি বিচ্ছিন্নতার (১৩) অন্ত্যেষ্টি ঘণ্টা বাজে। ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের আন্তর্জাতীয়করণ হয়েছে খাদ্যে, আচার-আচরণে, ভাবনায়; এতটা পরিমাণে হয়েছে যে ইচ্ছে হয় ইউরোপ ভূখণ্ডের অন্যান্য অভ্যাস এখানে যেমন চালু হয়েছে তেমনি কিছু ইংরাজি আচার-ব্যবহারও ইউরোপ ভূখণ্ডে সমান চালু হোক। যাই হোক, স্যালাড-তেলের প্রবর্তন ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে (১৮৫১ সালের আগে তা কেবল অভিজাতদের কাছেই সুবিদিত ছিল) ধর্ম বিষয়ে ইউরোপীয় ভূখণ্ডসুলভ সংশয়বাদেরও একটা মারাত্মক প্রসার ঘটেছে; এবং তা এতদূর গড়িয়েছে যে, চার্চ অব ইংলণ্ডের মতো ঠিক অতোটা 'আসল জিনিস' বলে এখনো গণ্য না হলেও অজ্ঞেয়বাদ শালীনতার দিক থেকে প্রায় ব্যাপটিস্ট (১৪) মতবাদের সমতুল্য এবং

নিশ্চতই 'স্যালভেশন আর্মির' (১৫) চেয়ে উচ্চে। না ভেবে পারি না যে, এই অবস্থায় নাস্তিকতার এ প্রসারে যাঁরা আন্তরিকভাবেই ক্ষুব্ধ ও তার নিন্দক, তাঁরা এই জেনে সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, এই সব 'হালফিল চালু ধারণাগুলো' বিদেশ থেকে আমদানি নয়, দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু সামগ্রীর মতো 'মেড-ইন-জার্মানি' নয়, বরং নিঃসন্দেহেই তা সাবেকী বিলাতী, এবং উত্তরপুরুষেরা এখন যতটা সাহস করে না দু'শ' বছর আগে তার চেয়েও অনেক দূর এগিয়েছিলেন তাঁদের বৃটিশ আদিপুরুষেরা।

বস্তুতপক্ষে, ল্যাঙ্কাশায়ারের একটা কথা ব্যবহার করলে, অজ্ঞেয়বাদ 'সসঙ্কোচ' বস্তুবাদ ছাড়া আর কী? প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদীর ধারণা আগাগোড়া বস্তুবাদী। সমগ্র প্রাকৃতিক জগত নিয়মে শাসিত, বাইরে থেকে তার ক্রিয়ায় কোনো হস্তক্ষেপের কথা একেবারে ওঠে না। কিন্তু, অজ্ঞেয়বাদী যোগ করে, জ্ঞাত বিশ্বের অতিরিক্ত কোনো পরম সত্তার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন অথবা খণ্ডনের কোনো উপায় আমাদের নেই। এ কথা হয়ত বা খাটত সেকালে যখন সেই মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর Mécanique céleste* গ্রন্থে স্রষ্টার উল্লেখ নেই কেন, নেপোলিয়নের এই প্রশ্নে লাপ্লাস সগর্বে জবাব দেন, 'Je n'avais pas besoin de cette hypothèse'**। কিন্তু বর্তমানে, বিশ্বের বিবর্তনী ধারণায় স্রষ্টা বা নিয়ন্তার কোনো স্থানই নেই; বিদ্যমান সমগ্র বিশ্ব থেকে বহির্ভূত এক পরম সত্তার কথা বলা স্ববিরোধসূচক, এবং আমার মনে হয়, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি একটা অকারণ অপমান।

অপিচ, আমাদের অজ্ঞেয়বাদী মানেন যে, জ্ঞানের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়দত্ত সংবাদ। কিন্তু তিনি যোগ করেন, ইন্দ্রিয়ের মারফত যে বস্তুর বোধ হচ্ছে তার সঠিক প্রতিচ্ছবিই যে ইন্দ্রিয় আমাদের দিয়েছে তা জানলাম কী করে? অতঃপর তিনি আমাদের জানিয়ে দেন, বস্তু বা তার গুণের কথা তিনি যখন বলেন তখন তিনি আসলে এসব বস্তু বা গুণের কথা বলছেন না, নিশ্চিত করে তার কিছু জানা সম্ভব নয়, স্বীয় ইন্দ্রিয়ের ওপর তারা যে ছাপ ফেলেছে শুধু তারই কথা বলছেন। এ ধরনের কথাকে কেবল যুক্তি বিস্তার করে হারান বোধ হয় সত্যিই শক্ত। কিন্তু যুক্তি বিস্তারের আগে হল ক্রিয়া।

* P. S., Laplace *Traité de mécanique céleste*. Vol. I—V. Paris, 1799—1825. — সম্পাঃ

** 'এ প্রকল্পের কোনো আবশ্যক আমার ছিল না।' — সম্পাঃ

Im Anfang war die Tat।* এবং মানবিক অতিবুদ্ধি এ সমস্যা আবিষ্কার করার আগেই মানবিক কর্মে তার সমাধান হয়ে গেছে। পুডিং-এর যাচাই তার ভক্ষণে। এই সব বস্তুর অনুভূত গুণাগুণ অনুসারে বস্তুটা আমাদের নিজেদের কাজে লাগালেই আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির সঠিকতা বা বেঠিকতার একটা নির্ভুল যাচাই হয়ে যায়। আমাদের এই অনুভূতিগুলি যদি ভুল হত, তাহলে সে বস্তুর ব্যবহারোপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের হিসাবও ভুল হতে বাধ্য এবং সব চেষ্টা বিফল হত। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে যদি আমরা সক্ষম হই, যদি দেখা যায় যে, বস্তুটা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তার সঙ্গে সে বস্তু মিলছে, তাকে যে উদ্দেশ্যে লাগাতে চাইছি তা হাসিল হচ্ছে, তাহলেই পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যায় যে, সে বস্তু এবং তার গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি ততটা পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে আমাদের বহিঃস্থিত বাস্তবের সঙ্গে। যদি বা বিফলতার সম্মুখীন হই, তাহলে সে বিফলতার কারণ বার করতে সাধারণত দেরি হয় না; দেখা যায়, যে অনুভূতির ভিত্তিতে আমরা কাজ করেছি সেটা হয় অসম্পূর্ণ ও ভাসাভাসা, নয় অন্যান্য অনুভূতির ফলাফলের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত যা আবশ্যক নয় — একে আমরা বলি যুক্তির ত্রুটি। ইন্দ্রিয়গুলিকে ঠিকমতো পরিশীলিত ও ব্যবহৃত করতে, এবং সঠিকভাবে গৃহীত ও সঠিকভাবে ব্যবহৃত অনুভূতি দ্বারা নির্দিষ্ট আওতার মধ্যে কর্মকে সীমাবদ্ধ রাখতে যতক্ষণ আমরা সচেষ্ট, ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, আমাদের কর্মের ফলাফল থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে অনুভূত বস্তুর অবজেকটিভ (objective) প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অনুভূতির মিল রয়েছে। এযাবৎ একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় নি যাতে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি দ্বারা আমাদের মনে বহির্জগত সম্পর্কে যে ধারণা উপার্জিত হচ্ছে তা তৎপ্রকৃতিগতভাবেই বাস্তব থেকে বিভিন্ন, কিংবা বহির্জগত ও সে বিষয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত গরমিল বর্তমান।

কিন্তু তখন আসেন নয়া-ক্যাণ্টপন্থী অজ্ঞেয়বাদীরা এবং বলেন: হাঁ, একটা বস্তুর গুণাগুণ বোধ আমাদের সঠিক হতে পারে, কিন্তু কোনো

* আদিতে ছিল কর্ম — গ্যেটের 'ফাউস্ট' থেকে। — সম্পাঃ

ইন্দ্রিয়গত বা মনোগত প্রকরণেই প্রকৃত-বস্তুটাকে (thing-in-itself) আমরা ধরতে পারি না। এই 'প্রকৃত-বস্তু' আমাদের জ্ঞানসীমার বাইরে। এর উত্তরে হেগেল বহু পূর্বেই বলেছিলেন: একটা বস্তুর সমস্ত গুণই যদি জানা যায় তাহলে আসল বস্তুটাকেই জানা হল; বাকি যা রইল সেটা এই সত্য ছাড়া কিছুই নয় যে, বস্তুটা আমাদের বাইরে বর্তমান; এবং ইন্দ্রিয় মারফত এই সত্যটি শেখা হলেই প্রকৃত-বস্তুটির, ক্যাণ্টের বিখ্যাত অজ্ঞেয় Ding an sich-এর চূড়ান্ত অবশেষটিও জানা হয়ে যায়। এর সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে যে, ক্যাণ্টের কালে প্রাকৃতিক বস্তু বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ছিল এতই টুকরো টুকরো যে, প্রত্যেকটা বস্তুর যেটুকু আমরা জানতাম তার পরেও একটা রহস্যময় 'প্রকৃত-বস্তুর' সন্দেহ তাঁর স্বাভাবিক। কিন্তু একের পর এক এই সব অধরা বস্তুগুলোকে ধরা হয়েছে, বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং আরো বড়ো কথা, **পুনরুৎপন্ন করা হয়েছে** বিজ্ঞানের অতিকায় প্রগতির কল্যাণে; আর যেটাকে আমরা উৎপন্ন করতে পারি সেটাকে নিশ্চয় অজ্ঞেয় বলে গণ্য করা যায় না। এ শতকের প্রথমার্ধে জৈব বস্তুগুলি ছিল রসায়নের কাছে এই ধরনের রহস্য-বস্তু; এখন জৈব প্রক্রিয়া ব্যতিরেকেই রাসায়নিক মৌলিক উপাদান থেকে একের পর এক তাদের বানাতে আমরা শিখেছি। আধুনিক রসায়নবিদরা ঘোষণা করেন, যে-বস্তুই হোক না কেন তার রাসায়নিক সংবিন্যাস জানতে পারলেই মৌলিক উপাদান থেকে তাকে তৈরি করা যায়। উচ্চ পর্যায়ের জৈব বস্তুর, এ্যালবুমিন-বস্তুর সংবিন্যাস এখনো আমরা জানতে পারি নি; কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পরেও তার জ্ঞান অর্জিত হবে না এবং তার সাহায্যে কৃত্রিম এ্যালবুমিন তৈরি করতে পারব না, এর কোনো যুক্তি নেই। যদি তা পারি, তাহলে সেই সঙ্গে জৈব জীবনও আমরা সৃষ্টি করতে পারব, কেননা এ্যালবুমিন-বস্তুর অস্তিত্বের স্বাভাবিক ধরন হল জীবন — তার নিম্নতম থেকে উচ্চতম রূপ পর্যন্ত।

এই সব আনুষ্ঠানিক মানসিক কুণ্ঠা পেশ করার পরেই কিন্তু আমাদের অজ্ঞেয়বাদীর কথা ও কাজ একেবারে এক ঝানু বস্তুবাদীর মতো, যা তাঁর আসল স্বরূপ। অজ্ঞেয়বাদী হয়ত বলবেন, **আমরা** যতটা জেনেছি তাতে পদার্থ ও গতিকে, অথবা বর্তমানে তার যা নাম, তেজকে (energy) সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না, কিন্তু কোনো না কোনো সময়ে যে তার সৃষ্টি হয় নি এমন প্রমাণ আমাদের নেই। কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁর এই স্বীকৃতি তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে গেলেই তিনি বাদীর

বক্তব্যাধিকার খারিজ করে দেবেন। In abstracto (বিমূর্ত ক্ষেত্রে) অধ্যাত্মবাদ (১৬) মানলেও in concreto (প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে) তা তিনি মোটেই মানতে রাজী নন। বলবেন, যতদূর আমরা জানি ও জানতে পারি তাতে বিশ্বের কোনো স্রষ্টা বা নিয়ন্তা নেই; আমাদের সঙ্গে যতটা সম্পর্ক তাতে পদার্থ বা তেজ সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না; আমাদের ক্ষেত্রে ভাবনা হল তেজের একটা ধরন, মস্তিষ্কের একটা ক্রিয়া; যা কিছু আমরা জানি তা এই যে, বাস্তব জগত অমোঘ নিয়ম দ্বারা শাসিত, ইত্যাদি। অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক মানুষ, যে ক্ষেত্রে তিনি কোনো কিছু **জানেন**, সে ক্ষেত্রে তিনি বস্তুবাদী; কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানের বাইরে যে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, সে অজ্ঞতাকে তিনি গ্রীকে অনুবাদ করে বলেন agnosticism বা অজ্ঞেয়বাদ।

যাই হোক, একটা জিনিস মনে হয় পরিষ্কার: আমি যদি অজ্ঞেয়বাদী হতাম, তাহলেও এই ছোট বইখানিতে ইতিহাসের যে ধারণা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেটাকে 'ঐতিহাসিক অজ্ঞেয়বাদ' বলে বর্ণনা করা যে যেত না তা স্পষ্ট। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা হাসাহাসি করতেন, অজ্ঞেয়বাদীরা সরোষে প্রশ্ন করতেন, আমি কি তাদের নিয়ে তামাসা শুরু করেছি? তাই আশা করি বৃটিশ শালীনতাবোধও অতিমাত্রায় স্তম্ভিত হবে না যদি ইংরাজি তথা অপরাপর বহু ভাষায় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' কথাটি আমি ব্যবহার করি ইতিহাস ধারার এমন একটা ধারণা বোঝাবার জন্য, যাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ ও মহতী চালিকা-শক্তির সন্ধান করা হয় সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে, তৎকারণে বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাগের মধ্যে এবং এই সব শ্রেণীর পারস্পরিক সংগ্রামের মধ্যে।

এ প্রশ্রয় বোধ হয় আরো পাওয়া সম্ভব যদি দেখানো যায় যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বৃটিশ শালীনতার পক্ষেও সুবিধাজনক হতে পারে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ইংলণ্ডে বসবাস করতে গিয়ে বিদগ্ধ বিদেশীদের যেটা বিস্মিত করত সেটাকে তাঁরা ইংরেজ শালীন মধ্য শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি আর নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করতে বাধ্য হতেন। আমি এবার প্রমাণ করতে চাই যে, বিদগ্ধ বিদেশীর কাছে সে সময় শালীন ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ঠিক যতটা নির্বোধ বলে মনে হত ততটা নির্বোধ তারা ছিল না। তাদের ধর্মীয় প্রবণতার ব্যাখ্যা আছে।

ইউরোপ যখন মধ্য যুগ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন শহরের উদীয়মান মধ্য শ্রেণী ছিল তার বিপ্লবী অংশ। মধ্যযুগীয় সামন্ত সংগঠনের মধ্যে তারা একটা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছিল, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠাও তার বর্ধমান ক্ষমতার তুলনায় অতি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে; মধ্য শ্রেণীর, bourgeoisie-র বিকাশের সঙ্গে সামন্ত ব্যবস্থার সংরক্ষণ খাপ খাচ্ছিল না; সুতরাং সামন্ত ব্যবস্থার পতন হতে হল।

কিন্তু সামন্ততন্ত্রের বিরাট আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। আভ্যন্তরীণ যুদ্ধাদি সত্ত্বেও তা সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক প্রতীচ্য ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বিরাট রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং তা ছিল যেমন সুখিস্মাটিক গ্রীক দেশগুলির বিরোধী, তেমনি মুসলিম দেশগুলির বিরোধী। সামন্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এ চার্চ স্বর্গীয় আশীর্বাণীর জ্যোতির্ভূষিত করে। সামন্ত কায়দায় এ চার্চ নিজের সোপানতন্ত্র গড়ে তোলে এবং শেষত, এ চার্চ নিজেই ছিল প্রবলতম এক সামন্ত অধিপতি, ক্যাথলিক জগতের পুরো এক তৃতীয়াংশ জমি ছিল এর দখলে। দেশে দেশে এবং সবিস্তারে অনৈশ্বরিক সামন্ততন্ত্রকে সফলভাবে আক্রমণ করার আগে তার এই পবিত্র কেন্দ্রীয় সংগঠনটিকে ধ্বংস করার দরকার ছিল।

তাছাড়া মধ্য শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সমান্তরালে শুরু হয় বিজ্ঞানের বিপুল পুনরুজ্জীবন; ফের শুরু হয় জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবৃত্তের চর্চা। শিল্পোৎপাদন বিকাশের জন্য বুর্জোয়ার দরকার ছিল একটা বিজ্ঞান, যা প্রাকৃতিক বস্তুর দৈহিক গুণাগুণ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-পদ্ধতি নিরূপিত করবে। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান হয়ে ছিল গির্জার বিনীত সেবাদাসী, খৃষ্ট বিশ্বাসের আরোপিত সীমা তাকে লঙ্ঘন করতে দেওয়া হত না, সেই কারণে তা আদৌ বিজ্ঞানই ছিল না। বিজ্ঞান বিদ্রোহ করল গির্জার বিরুদ্ধে; বিজ্ঞান ছাড়া বুর্জোয়ার চলছিল না, তাই সে বিদ্রোহে যোগ দিতে হল তাকে।

প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সঙ্গে উদীয়মান মধ্য শ্রেণী যে কারণে সংঘাতে আসতে বাধ্য, তার শুধু দুটি ক্ষেত্র এই যে ছুঁয়ে গেলাম তা সত্ত্বেও এটা দেখানোর পক্ষে তা যথেষ্ট যে, প্রথমত, রোমান চার্চের দাবির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর; এবং দ্বিতীয়ত, সে সময় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রামকেই নিতে হত ধর্মীয় ছদ্মবেশ, পরিচালিত করতে হত সর্বাগ্রে চার্চের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের ব্যবসায়ীরা কলরবের সূত্রপাত করলেও প্রবল সাড়া পাওয়া নিশ্চিত ছিল এবং পাওয়া যায় ব্যাপক গ্রামবাসীদের মধ্যে, চাষীদের মধ্যে — আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে যাদের সংগ্রাম করতে হত নিতান্ত প্রাণধারণের জন্যই।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় বুর্জোয়ার দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতি পায় তিনটি নির্ধারক মহাযুদ্ধে।

প্রথমটিকে বলা হয় জার্মানির প্রটেস্টান্ট রিফর্মেশন (সংস্কার)। চার্চের বিরুদ্ধে লুথার যে রণধ্বনি তোলেন তাতে সাড়া দেয় দুটি রাজনৈতিক চরিত্রের অভ্যুত্থান: প্রথমে ফ্রানৎস ফন জিকিঙ্গেনের নেতৃত্বে নিম্ন অভিজাতদের অভ্যুত্থান (১৫২৩), পরে —১৫২৫ সালে — মহান কৃষকযুদ্ধ। দুটিই পরাজিত হয় প্রধানত যে-দলগুলির সবচেয়ে বেশি স্বার্থ, শহরের সেই বার্গারদের (সামন্ত অধিকার বহির্ভূত নাগরিক) অনিশ্চিতমতির ফলে, এ অনিশ্চিতমতির কারণ নিয়ে আলোচনা এখানে সম্ভব হচ্ছে না। সেই সময় থেকে স্থানীয় রাজন্য আর কেন্দ্রীয় শক্তির মধ্যে লড়াইয়েতে সে সংগ্রামের অধঃপতন ঘটে এবং তার পরিণাম, ইউরোপের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় জাতিগুলির ভেতর থেকে দুশ' বছরের জন্য জার্মানির মুছে যাওয়া। লুথারীয় রিফর্মেশন থেকে সৃষ্টি হল এক নতুন ধর্মমত, স্বৈরশক্তি রাজতন্ত্রেরই উপযোগী একটা ধর্ম। উত্তর-পূর্ব জার্মানির কৃষকেরা লুথারবাদ গ্রহণ করতে না করতেই স্বাধীন লোক থেকে তারা পরিণত হল ভূমিদাসে।

কিন্তু লুথার যেখানে পারেন নি, সেখানে জিতলেন কালভিন। কালভিনের ধর্মমত ছিল তাঁর কালের সবচেয়ে সাহসী বুর্জোয়াদের উপযোগী। প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক জগতে সাফল্য অসাফল্য মানুষের কর্ম বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার সাধ্যাতীত পরিস্থিতির ওপর, এই ঘটনাটার এক ধর্মীয় অভিব্যক্তি হল তাঁর ঐশ্বরিক নির্বন্ধ (predestination) মতবাদ। নির্ধারিত হচ্ছে কারো সংকল্পে নয়, কারো কর্মে নয়, উচ্চতর অজানা অর্থনৈতিক শক্তির কৃপায়; এটা সবিশেষ সত্য ছিল অর্থনৈতিক বিপ্লবের সেই এক যুগে যখন সমস্ত পুরনো বাণিজ্য পথ ও কেন্দ্রের জায়গায় আসছে নতুন পথ, নতুন কেন্দ্র, যখন ভারত ও আমেরিকা উন্মুক্ত হয়েছে দুনিয়ার কাছে, এবং যখন বিশ্বাসের পবিত্রতম অর্থনৈতিক প্রতীক, সোনা ও রুপোর দামও টলতে শুরু করেছে, ভেঙে পড়ছে। কালভিনের গির্জা-গঠনতন্ত্র পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক। এবং

ইউরোপে রাষ্ট্র যেখানে প্রজাতান্ত্রিক রূপ দেওয়া হয়েছে সেখানে ঈশ্বরের রাজত্ব কি হতে পারে রাজরাজড়া, বিশপ আর সামন্তপ্রভুর অধীনে? জার্মান লুথারবাদ যে ক্ষেত্রে রাজন্যদের হাতে বশম্বদ হাতিয়ার হয়ে রইল সে ক্ষেত্রে কালভিনবাদ হল্যান্ডে প্রতিষ্ঠা করল একটি প্রজাতন্ত্র এবং ইংলন্ডে সর্বোপরি স্কটল্যান্ডে গড়ে তুলল সক্রিয় প্রজাতান্ত্রিক পার্টি।

কালভিনবাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহান বুর্জোয়া অভ্যুত্থান পেল তার তৈরি মতবাদ। এ অভ্যুত্থান ঘটে ইংলন্ডে। শহরের মধ্য শ্রেণী তাকে শুরু করে আর গ্রামাঞ্চলের মধ্য চাষীরা (yeomanry) তা লড়ে শেষ করে। মজার ব্যাপার এই যে মহান তিনটি বুর্জোয়া অভ্যুত্থানেই লড়াইয়ের সৈন্যবাহিনী জোগায় কৃষকসম্প্রদায়, অথচ জয়লাভ হবার পরেই সে জয়লাভের অর্থনৈতিক ফলাফলে অতিনিশ্চিত যারা ধ্বংস হতে বাধ্য তারা হল এই কৃষকেরাই। ক্রমওয়েলের একশ' বছর পরে ইংলন্ডের কৃষককুল প্রায় অদৃশ্য হয়। মোটের ওপর কৃষককুল ও শহরের প্লেবিয়ান অংশ না থাকলে একা বুর্জোয়ারা কখনোই চরম পরিণতি পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেত না এবং প্রাণদণ্ডের মঞ্চে কখনোই এনে দাঁড় করাত না প্রথম চার্লসকে। বুর্জোয়ার যে সমস্ত বিজয় তখন অর্জনযোগ্য হয়ে উঠেছে শুধু সেইগুলো লাভ করতে হলেও বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় আরো বহুদূর পর্যন্ত — ঠিক ১৭৯৩ সালের ফ্রান্স এবং ১৮৪৮ সালের জার্মানির মতো। বস্তুত এ যেন বুর্জোয়া সমাজের বিবর্তনের একটা নিয়ম বলেই মনে হয়।

বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের এই আধিক্যের পর অবশ্যই আসে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এবং যে সীমা পর্যন্ত সে প্রতিক্রিয়ার বজায় থাকা সম্ভব তাও সে ছাড়িয়ে যায়। একাদিক্রমে এদিক ওদিক দোলার পর অবশেষে পাওয়া গেল নতুন ভারকেন্দ্র এবং তা থেকে শুরু হল একটা নতুন সূচনা। ইংলন্ডের ইতিহাসের যে সমারোহী যুগটা ভদ্রসম্প্রদায়ের কাছে 'মহা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত সেই যুগ ও তার পরবর্তী সংগ্রামগুলির অবসান হয় অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ এক ঘটনায়, উদারনৈতিক ঐতিহাসিকেরা যার নাম দিয়েছেন 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব' (১৭)।

নতুন সূচনাটি হল উদীয়মান মধ্য শ্রেণী ও ভূতপূর্ব সামন্ত জমিদারদের মধ্যে আপস। এখনকার মতোই এ জমিদারদের অভিজাত বলা হলেও বহু আগে থেকেই তারা সেই পথ নিয়েছিল যাতে তারা হয়ে ওঠে বহু পরবর্তী যুগের ফ্রান্সের লুই ফিলিপের মতো 'রাজ্যের প্রথম বুর্জোয়া'। ইংলন্ডের

পক্ষে সৌভাগ্যবশত গোলাপের যুদ্ধের (১৮) সময় পুরনো সামন্ত ব্যারনেরা পরস্পরকে হত্যা করে। তাদের উত্তরাধিকারীরা অধিকাংশই প্রাচীন বংশোদ্ভূত হলেও প্রত্যক্ষ বংশধারা থেকে এতই দূরে যে, এরা একটা নতুন সম্প্রদায় হয়ে ওঠে, তাদের অভ্যাস ও মনোবৃত্তি সামন্ততান্ত্রিকের চেয়ে অনেক বেশি বুর্জোয়া। টাকার দাম তারা বেশ বুঝত এবং অবিলম্বেই শত শত ক্ষুদে চাষীকে উচ্ছেদ করে সে জায়গায় ভেড়া রেখে তারা খাজনা বেশি তুলতে শুরু করে। অষ্টম হেনরি গির্জার জমির হরির লুট করে পাইকারি হারে নতুন নতুন বুর্জোয়া জমিদার সৃষ্টি করেন; অসংখ্য মহালের বাজেয়াপ্তি ও একেবারে ভুঁইফোড় বা অপেক্ষাকৃত ভুঁইফোড়দের নিকট তা ফের বিলি, গোটা সপ্তদশ শতাব্দী ধরে যা চলে, তাতেও একই ফল হয়। সুতরাং, সপ্তম হেনরির সময় থেকে ইংরেজ 'অভিজাতরা' শিল্প উৎপাদনের বিকাশে বাধা দেবার বদলে উল্টে সরাসরি তাই থেকেই মুনাফা তোলার চেষ্টা করেছে; এবং চিরকালই বড়ো বড়ো জমিদারদের এমন একটা অংশ ছিল যারা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে অর্থপতি ও শিল্পজীবী বুর্জোয়াদের মাতব্বরদের সঙ্গে সহযোগিতায় ইচ্ছুক। ১৬৮৯ সালের আপস তাই সহজেই সাধিত হয়। 'সম্পত্তি ও চাকুরির' রাজনৈতিক লুট রইল বড়ো বড়ো ভূস্বামী বংশের জন্য এই শর্তে যে, অর্থপতি, কারখানাজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ যথেষ্ট দেখা হবে। আর এই সব অর্থনৈতিক স্বার্থই ছিল তখন দেশের সাধারণ পলিসি নির্দেশ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। খুঁটিনাটি ব্যাপারে ঝগড়া হয়ত হত, কিন্তু মোটের ওপর অভিজাত গোষ্ঠীতন্ত্র খুব ভালোই জানত যে, তার নিজস্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনিবার্যরূপে জড়িয়ে আছে শিল্পজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণীর উন্নতির সঙ্গে।

সেই সময় থেকে ইংলন্ডের শাসক শ্রেণীগুলির একটি বিনীত কিন্তু তথাপি স্বীকৃত অংশ হল বুর্জোয়ারা। অন্যান্য শাসক শ্রেণীর সঙ্গে এদেরও সমান স্বার্থ ছিল দেশের বিপুল মেহনতীজনদের বশে রাখা। বণিক বা কারখানা-মালিক (manufacturer) নিজেই হল তার কেরাণী, তার মজুর, তার বাড়ির চাকরবাকরদের কাছে প্রভু, বা কিছু আগে পর্যন্তও যা বলা হত, 'স্বভাবতই ঊর্ধ্বতন'. তাদের কাছ থেকে যথাসাধ্য বেশি ও যথাসাধ্য ভালো কাজ আদায় করাই তার স্বার্থ, সে উদ্দেশ্যে ঠিকমতো বাধ্যতার শিক্ষায় তাদের তালিম দেওয়ার কথা। নিজেই সে ছিল ধর্মভীরু; ধর্মের পতাকা

নিয়েই সে রাজা ও লর্ডদের বিরুদ্ধে লড়েছে, স্বভাবতই অধস্তনদের মনের ওপর প্রভাব ফেলে. তাদেরকে ঈশ্বর প্রসাদে স্থাপিত প্রভুটির আদেশাধীন করে তোলার দিক থেকে এ ধর্ম যে সুবিধা দান করছে তা আবিষ্কার করতে তার দেরি হয় নি। সংক্ষেপে 'ছোট লোকদের', দেশের বিপুল উৎপাদক জনগণকে দাবিয়ে রাখার কাজে ইংরেজ বুর্জোয়াকে এবার অংশ নিতে হচ্ছে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত অন্যতম একটা উপায় হল ধর্মের প্রভাব।

আর একটা ঘটনাও ছিল যাতে বুর্জোয়াদের ধর্মীয় প্রবণতা বেড়েছে। সেটা হল ইংলণ্ডে বস্তুবাদের উদয়। এই নতুন মতবাদ মধ্য শ্রেণীর ধর্মানুভূতিতেই শুধু ঘা দেয় নি, বুর্জোয়া সমেত বিপুল অশিক্ষিত জনগণের যাতে বেশ চলে যায় সেই ধর্মের বিপরীতে এ মতবাদ নিজেকে জাহির করল কেবল দর্শন বলে, যা বিশ্বের পণ্ডিত ও বিদগ্ধ জনেরই যোগ্য। হব্‌সের হাতে বস্তুবাদ মঞ্চে আসে রাজকীয় বিশেষাধিকার ও সর্বশক্তিমত্তার সমর্থক হিশেবে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে তা আহ্বান করে সেই puer robustus sed malitiosus* অর্থাৎ জনগণকে দমন করতে. একই ভাবে হব্‌সের পরবর্তীদের   বলিংব্রুক, শ্যাফ্‌ট্‌সবেরি ইত্যাদির নতুন বস্তুবাদী deistic ধারাটা থেকে যায় একটা অভিজাত, esoteric* মতবাদ হিশেবে এবং সেই হেতু মধ্য শ্রেণীর কাছে তা ঘৃণ্য হয়, তার ধর্মীয় ধৃষ্টোক্তি ও বুর্জোয়া বিরোধী রাজনৈতিক যোগাযোগ উভয় কারণেই। এই ভাবে অভিজাতদের deism ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল মধ্য শ্রেণীর প্রধান শক্তি যোগাতে থাকল সেই সব প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়েরাই যারা রণপতাকা ও সংগ্রামী বাহিনী জুগিয়েছিল স্টুয়ার্টদের বিরুদ্ধে, 'মহান উদারনৈতিক পার্টির' মেরুদণ্ড আজো পর্যন্ত তারাই।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ড থেকে বস্তুবাদ চলে যায় ফ্রান্সে, সেখানে আর একটি বস্তুবাদী দার্শনিক ধারার, কার্তেজিয়ানবাদের (১৯) একটি শাখার সংস্পর্শে সে আসে ও তার সঙ্গে মিশে যায়। ফ্রান্সেও প্রথম দিকে বস্তুবাদ থাকে একটা একান্তভাবে অভিজাত মতবাদ হিশেবে. কিন্তু অচিরেই তার বিপ্লবী চরিত্র আত্মপ্রকাশ করল। ফরাসী বস্তুবাদীরা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখল না; তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক

* ডাগড়াই কিন্তু হিংস্র ছোকরা। — সম্পাঃ

** মন্ত্রগুপ্ত, শুধু দীক্ষিতের অধিগম্য। — সম্পাঃ

প্রতিষ্ঠান যা কিছু সামনে পড়ল সবেতেই প্রসারিত করল তাদের সমালোচনা; তাদের মতবাদের সর্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতার দাবি প্রমাণের জন্য সংক্ষিপ্ততম পন্থা অবলম্বন করে সাহসের সঙ্গে তা জ্ঞানের সবকটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করল এক অতিকায় রচনায়, Encyclopédie-র (২০), যা থেকে তাদের নাম। এই ভাবে খোলাখুলি বস্তুবাদ বা deism, এই দুই ধারার কোনো না কোনো একটা রূপে বস্তুবাদ হয়ে দাঁড়ায় ফ্রান্সের সমগ্র সংস্কৃতিবান যুবসমাজের মতবাদ; এতটা পরিমাণে হল যে মহান বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন ইংরেজ রাজতন্ত্রীদের সৃষ্ট মতবাদটা থেকেই এল ফরাসী প্রজাতন্ত্রী ও সন্ত্রাসবাদীদের তাত্ত্বিক ধ্বজা, এবং 'মানবিক অধিকার ঘোষণাপত্রের' (২১) বয়ান। মহান ফরাসী বিপ্লব হল বুর্জোয়াদের তৃতীয় অভ্যুত্থান, কিন্তু এই প্রথম বিপ্লব যা ধর্মের আলখাল্লাটা একেবারে ছুঁড়ে ফেলে এবং লড়াই চালায় অনাবরণ রাজনৈতিক ধারায়। এদিক থেকেও এটা প্রথম যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের একপক্ষের, অর্থাৎ অভিজাতদের বিনাশ এবং অন্যপক্ষের, বুর্জোয়ার পরিপূর্ণ জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত সত্যি করেই সে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হয়। ইংলণ্ডে প্রাক্‌বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর প্রতিষ্ঠানাদির ধারাবাহিকতা এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের মধ্যেকার আপসের প্রকাশ হয় আদালতী নজিরের ধারাবাহিকতায় এবং আইনের সামন্ততান্ত্রিক রূপগুলির ধর্মীয় সংরক্ষণে। ফ্রান্সে অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটায় বিপ্লব; সামন্ততন্ত্রের শেষ রেশটুকুও তা সাফ করে Code Civil এর (২২) মাধ্যমে আধুনিক পুঁজিবাদী পরিস্থিতির উপযোগী করে চমৎকার খাপ খাইয়ে নেয় প্রাচীন রোমক আইন সংহিতাকে — মার্কস যাকে বলেছিলেন পণ্যোৎপাদন, সেই অর্থনৈতিক পর্যায়ের অনুসারী আইনী সম্পর্কের একটি প্রায় নিখুঁত প্রকাশ ছিল তাতে, — এমন চমৎকার খাপ খাইয়ে নেয় যে, এই ফরাসী বিপ্লবী বিধি-সংহিতাটি আজো পর্যন্ত অন্য সব দেশের সম্পত্তি-আইন সংস্কারের আদর্শস্বরূপ, ইংলণ্ডও বাদ নয়। অবশ্য, ইংরেজি আইন যদিও পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রকাশ করে চলেছে সেই এক বর্বর সামন্ততান্ত্রিক ভাষায় যার সঙ্গে উদ্দিষ্ট বস্তুর ততটাই সাদৃশ্য যতটা সাদৃশ্য ইংরাজি বানানের সঙ্গে ইংরেজি উচ্চারণের   vous écrivez Londres et vous prononcez Constantinople* বলেছিলেন জনৈক ফরাসী — তবু এ কথা ভোলা ঠিক নয়

* লেখেন লণ্ডন কিন্তু উচ্চারণ করেন কনস্টান্টিনোপল। — সম্পাঃ

যে, সেই একই ইংরাজি আইনই একমাত্র আইন যা প্রাচীন জার্মান ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বশাসন এবং আদালত ছাড়া অন্য সমস্ত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির সেরা অংশটিকে যুগে যুগে রক্ষা করে এসেছে এবং প্রেরণ করেছে আমেরিকা ও উপনিবেশে – নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগে ইউরোপ ভূখণ্ড থেকে এ জিনিসটা লোপ পায় এবং এখনো পর্যন্ত কোথাও তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নি।

আমাদের বৃটিশ বুর্জোয়ার কথায় ফেরা যাক। ফরাসী বিপ্লবের ফলে তার একটা চমৎকার সুযোগ হল ইউরোপ ভূখণ্ডের রাজতন্ত্রগুলির সাহায্যে ফরাসী নৌবাণিজ্য ধ্বংস, ফরাসী উপনিবেশ অধিকার এবং জলপথে ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ দাবিটাকেও চূর্ণ করার। ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে বৃটিশ বুর্জোয়া যে লড়েছিল তার একটা কারণ এই। আর একটা কারণ, এ বিপ্লবের ধরণ-ধারনটা তার রুচিতে বড়ো বেশি বেধেছিল। তার 'জঘন্য' সন্ত্রাসটাই শুধু নয়, বুর্জোয়া শাসনকে চরমে নিয়ে যাবার চেষ্টাটাই। তাদের যে অভিজাতরা বৃটিশ বুর্জোয়াকে নিজেদের আদব কায়দা শিখিয়ে তুলেছে, ফ্যাশন উদ্ভাবন করে দিয়েছে তার জন্য, যারা অফিসার জুগিয়েছে সেই সৈন্যবাহিনীতে, যা শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে স্বদেশে, এবং সেই নৌবাহিনীতে, যা জয় করে দিয়েছে ঔপনিবেশিক সম্পত্তি এবং বিদেশের নতুন নতুন বাজার – তাদের বাদ দিয়ে বৃটিশ বুর্জোয়ার চলে কী করে? বুর্জোয়াদের একটা প্রগতিশীল সংখ্যালঘু অংশ অবশ্য ছিল, আপসের ফলে এ সংখ্যালঘুর স্বার্থ তত বেশি দেখা হচ্ছিল না। প্রধানত অপেক্ষাকৃত কম সম্পন্ন মধ্য শ্রেণীর তৈরি এই অংশটার সহানুভূতি ছিল বিপ্লবের প্রতি, কিন্তু পার্লামেণ্টে তার ক্ষমতা ছিল না।

এ ভাবে বস্তুবাদ যতই হয়ে ওঠে ফরাসী বিপ্লবের মতবাদ ততই ধর্মভীরু ইংরেজ বুর্জোয়া আরো বেশি আঁকড়ে ধরে ধর্ম জনগণের ধর্মচেতনা লোপ পেলে তার ফল কী দাঁড়ায় তা কি প্যারিস সন্ত্রাসের কালে প্রমাণ হয় নি? বস্তুবাদ যতই ফ্রান্স থেকে আশেপাশের দেশে ছড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করছিল অনুরূপ মতধারা থেকে, বিশেষ করে জার্মান দর্শন থেকে, সাধারণভাবে স্বাধীন চিন্তা ও বস্তুবাদ যতই ইউরোপ ভূখণ্ডে বস্তুতপক্ষে বিদগ্ধ ব্যক্তির অনিবার্য গুণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, ততই গোঁ ধরে ইংরেজ মধ্য শ্রেণী আঁকড়ে রইল তার বহুবিধ ধর্মবিশ্বাসকে। এ সব ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে

পারস্পরিক তফাৎ যতই থাকুক তাদের সবকটিই হল পরিষ্কার রকমের ধর্মীয়, খৃষ্টীয় বিশ্বাস।

বিপ্লব যখন ফ্রান্সে বুর্জোয়ার রাজনৈতিক বিজয় নিশ্চিত করছিল, সেই সময় ইংলণ্ডে ওয়াট আর্করাইট, কার্টরাইট প্রভৃতিরা সূচিত করে এক শিল্প বিপ্লবের, অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভারকেন্দ্র তাতে পুরোপুরি সরে যায়। ভূমিজীবী অভিজাতদের চেয়ে বুর্জোয়ার সম্পদ বেড়ে উঠতে লাগল অতি দ্রুতগতিতে। খাস বুর্জোয়ার মধ্যেই অর্থপতি অভিজাত, ব্যাঙ্কার প্রভৃতিদের ক্রমেই পেছনে ঠেলে এগিয়ে এল কারখানা-মালিকেরা। ১৬৮৯ সালের আপস এযাবৎ ক্রমশ বুর্জোয়ার অনুকূলে পরিবর্তিত হয়ে এলেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পারস্পরিক অবস্থানের সঙ্গে তা আর খাপ খাচ্ছিল না। পক্ষগুলির চরিত্রেও বদল হয়েছে, ১৮৩০ সালের বুর্জোয়ারা আগের শতকের বুর্জোয়ার চেয়ে ভয়ানক পৃথক। অভিজাতদের হাতে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা তখনো থেকে গিয়েছিল এবং নতুন শিল্পজীবী বুর্জোয়ার দাবি-দাওয়া প্রতিরোধে যা ব্যবহৃত হচ্ছিল, তা নতুন অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয়ে দাঁড়ায়। অভিজাতদের সঙ্গে একটা নতুন লড়াইয়ের প্রয়োজন পড়ল; তার পরিণতি হতে পারত কেবলমাত্র নতুন অর্থনৈতিক শক্তির জয়লাভে। প্রথমে, ১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে, সমস্ত প্রতিরোধ সত্ত্বেও সংস্কার আইন (Reform Act) (২৩) পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। এতে পার্লামেণ্টে বুর্জোয়ারা পেল একটা শক্তিশালী ও সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠা। তারপর শস্য আইন বরবাদ (২৪), এতে ভূমিজীবী অভিজাতদের ওপর বুর্জোয়ার, বিশেষ করে তার সবচেয়ে সক্রিয় অংশ - কারখানা-মালিকদের প্রাধান্য চিরকালের মতো নির্দিষ্ট হয়ে গেল। বুর্জোয়ার এই সবচেয়ে বড়ো জয়; একান্ত নিজের স্বার্থে অর্জিত বিজয় হিসেবে এই আবার কিন্তু তার শেষ বিজয়। পরে যা কিছু সে জিতেছে তা ভাগ করে নিতে হয়েছে নতুন একটা সামাজিক শক্তির সঙ্গে, এ শক্তি ছিল প্রথমে তার সহায়, কিন্তু অচিরেই হয়ে দাঁড়াল তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

শিল্প বিপ্লবে বৃহৎ কারখানা-মালিক পুঁজিপতিদের একটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল তাদের চেয়ে অনেক সংখ্যাবহুল কারখানা কর্মীদের একটা শ্রেণী। যে অনুপাতে শিল্প বিপ্লব উৎপাদনের একটা শাখার পর আর একটা শাখা অধিকার করতে থাকে

সেই অনুপাতে এ শ্রেণী ক্রমশ সংখ্যায় বেড়ে ওঠে এবং সেই অনুপাতেই হয়ে ওঠে শক্তিশালী ১৮২৪ সালেই এ শক্তির প্রমাণ সে দেয় — শ্রমিকদের সমিতি (২৫) গঠনের নিষেধ-আইন নাকচ করতে অনিচ্ছুক পার্লামেণ্টকে বাধ্য করে। সংস্কার আন্দোলনের সময় শ্রমিকেরা ছিল সংস্কার দলের Reform party) র‍্যাডিক্যাল অংশ, ১৮৩২ সালের আইনে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করায় তারা জনগণের চার্টার বা সনদে (২৬) নিজেদের দাবি-দাওয়া নির্দিষ্ট করে শস্য আইন বিরোধী বৃহৎ বুর্জোয়া পার্টির (২৭) বিপরীতে নিজেদের সংগঠিত করে এক স্বাধীন চার্টিস্ট পার্টিতে, আধুনিক কালে এই প্রথম মজুর পার্টি।

তারপর শুরু হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে ইউরোপ ভূখণ্ডের বিপ্লবগুলি। এতে শ্রমিকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নেয় এবং, অন্তত প্যারিসে, তারা যেসব দাবি-দাওয়া উপস্থিত করে পুঁজিবাদী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা ছিল নিশ্চিতই অননুমোদনীয়। তারপর শুরু হয় সাধারণ প্রতিক্রিয়া। প্রথমে, ১৮৪৮ সালের ১০ই এপ্রিল চার্টিস্টদের পরাজয়, তারপর সেই বছরেই জুনে প্যারিস শ্রমিকদের অভ্যুত্থান দমন, তারপর ইতালি হাঙ্গেরি, দক্ষিণ জার্মানিতে ১৮৪৯ সালের বিপর্যয়, পরিশেষে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর প্যারিসের ওপর লুই বোনাপার্টের জয়। অন্ততঃ কিছু কালের জন্য শ্রমিক দাবি-দাওয়ার জুজুটাকে দমন করা গেল, কিন্তু কী মূল্য দিয়ে! সাধারণ লোককে ধর্মভীরু করে রাখার প্রয়োজনীয়তা যদি বৃটিশ বুর্জোয়ারা আগেই বুঝে থাকে, তবে এত সব অভিজ্ঞতার পর সে প্রয়োজনীয়তা তারা আরো কত বেশিই না টের পাচ্ছে! ইউরোপ ভূখণ্ডের ভাই বন্ধুদের বিদ্রূপের পরোয়া না করে তারা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বাইবেল প্রচারের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে চলেছে; নিজেদের স্বদেশী ধর্মযন্ত্রে তুষ্ট না হয়ে তারা আবেদন জানিয়েছে ধর্মব্যবসার বৃহত্তম সংগঠক জোনাথান ভাইয়ের (২৮, কাছে এবং আমেরিকা থেকে আমদানি করেছে রিভাইভ্যালিজ্‌ম্ (২৯), মুডি, স্যাঙ্কি প্রভৃতিদের; এবং পরিশেষে 'স্যালভেশন আর্মির' বিপজ্জনক সাহায্যও গ্রহণ করেছে — এরা আদি খৃষ্ট ধর্মের প্রচার ফিরিয়ে আনছে, সেরা অংশ হিশেবে আবেদন করে গরিবদের কাছে, পুঁজিবাদের সঙ্গে লড়ে ধর্মের মধ্যে দিবে এবং এই ভাবে আদি খৃষ্টীয় শ্রেণী বৈরের একটা বীজ

লালন করে তুলছে, যে সম্পন্ন লোকেরা আজ এর জন্য নগদ টাকা ধরে দিচ্ছে তাদের কাছে যা হয়ত একদিন মুশকিল বাধাবে।

মনে হয় এ যেন ঐতিহাসিক বিকাশের একটা নিয়ম যে, মধ্য যুগে সামন্ত অভিজাতরা যে-ভাবে একচ্ছত্ররূপে নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রেখেছিল, কোনো ইউরোপীয় দেশেই বুর্জোয়ারা সে-ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা রাখতে পারবে না অন্তত বেশ কিছু দিনের জন্য। এমনকি সামন্ততন্ত্র যেখানে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই ফ্রান্সেও বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে সরকারের পুরো দখল পেয়েছে কেবল অতি স্বল্প কতকগুলি সময়ের জন্য। ১৮৩০ — ১৮৪৮ সালে লুই ফিলিপের রাজত্বকালে বুর্জোয়াদের একটা ক্ষুদ্র অংশই রাজ্য চালায়, যোগ্যতার কড়া সর্তের ফলে তাদের বড়ো অংশটাই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে, ১৮৪৮ — ১৮৫১ সালের মধ্যে, সমগ্র বুর্জোয়াই শাসন চালায়, কিন্তু কেবল তিন বছরের জন্য, তাদের অক্ষমতায় এল দ্বিতীয় সাম্রাজ্য। মাত্র এখন, তৃতীয় প্রজাতন্ত্রেই বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে সরকারের কর্ণধার হয়ে আছে কুড়ি বছরেরও বেশি কাল এবং ইতিমধ্যেই তাদের অবক্ষয়ের শুভলক্ষণ ফুটে উঠছে। বুর্জোয়াদের একটা স্থায়ী শাসন সম্ভব হয়েছে কেবল আমেরিকার মতো দেশে, যেখানে সামন্ততন্ত্র অজানা এবং সমাজ প্রথম থেকেই শুরু হয় বুর্জোয়া ভিত্তিতে। এবং এমনকি ফ্রান্স ও আমেরিকাতেও বুর্জোয়ার উত্তরাধিকারী শ্রমিক জনগণ ইতিমধ্যেই দ্বারে করাঘাত শুরু করেছে।

ইংলণ্ডে বুর্জোয়াদের কখনোই একক ক্ষমতা ছিল না। ১৮৩২ সালের বিজয়ের পরেও ভূমিজীবী অভিজাতদের হাতে রেখে দেওয়া হয় প্রধান প্রধান সরকারী পদের প্রায় পূর্ণ দখল ধনী মধ্য শ্রেণী যে রূপ বিনয়ে এটা মেনে নেয় তা আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল ততদিন পর্যন্ত যতদিন না উদারনীতিক বৃহৎ কলওয়ালা মিঃ ডবলিউ এ. ফর্স্টার প্রকাশ্য ভাষণে ব্র্যাডফোর্ডের যুবসম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করেন দুনিয়ায় চলতে হলে ফরাসী শিখতে হবে, এবং নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিশেবে তাঁকে যখন এমন একটা মহলে চলাফেরা করতে হত যেখানে ফরাসী ভাষা অন্তত ইংরাজি ভাষার মতোই জরুরী, তখন তাঁকে কী আহাম্মকই না লাগত। আসলে তখনকার ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ছিল সাধারণত একেবারে অশিক্ষিত ভুঁইফোঁড়, অভিজাতদের তারা উচ্চতর

সেই সব সরকারী পদ না দিয়ে পারত না যেখানে ব্যবসায়ী চতুরতার চেয়ে একটা নিতান্ত গণ্ডিবদ্ধ সংকীর্ণতা ও গণ্ডিবদ্ধ অহমিকা ছাড়াও অন্য যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল।* এমনকি এখনো মধ্য শ্রেণীর শিক্ষা বিষয়ে সংবাদপত্রের অনবসান বিতর্ক থেকে দেখা যায়, ইংরেজ মধ্য শ্রেণী এখনো নিজেকে সেরা শিক্ষার যোগ্য বলে মনে করছে না, কিছু কম-সমের দিকেই তার চোখ। সুতরাং, শস্য আইন বাতিল করার পরেও এ যেন স্বাভাবিক যে, কবডেন, ব্রাইট, ফর্স্টার প্রভৃতি যে লোকেরা জিতল তারা দেশের সরকারী শাসনের অংশ থেকে বঞ্চিত রইল পরবর্তী কুড়ি বছর পর্যন্ত, যতদিন না নতুন একটা সংস্কার আইনে (৩০) ক্যাবিনেটের দ্বার উন্মুক্ত হয় তাদের জন্য। ইংরেজ বুর্জোয়ারা আজো পর্যন্ত তাদের সামাজিক হীনতাবোধে এত বেশি আচ্ছন্ন যে, সমস্ত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তারা যোগ্যরূপে জাতির প্রতিনিধিত্বের জন্য স্বীয় খরচায় এবং জাতির খরচায় এক দল শোভাবর্ধক নিষ্কর্মার প্রতিপালন করে চলেছে; এবং

---

* এমনকি ব্যবসার ক্ষেত্রেও জাতীয় শোভিনিজমের অহমিকা এক অতি কুপরামর্শ। হাল আমল পর্যন্ত গড়পড়তা ইংরেজ কলওয়ালা মনে করত নিজভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলা ইংরেজের পক্ষে মর্যাদাহানিকর, 'বিদেশের বেচারা ভূতেরা' ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করে তার হাত থেকেই মাল নিয়ে বিদেশে বিক্রি করার ঝামেলা নিচ্ছে, এতে তার আর কিছু নয় বরং খানিকটা গর্বই হত। এটা তার কখনো নজরে আসে নি যে, এই বিদেশীরা, প্রধানত জার্মানরা, এই ভাবে বৃটিশ বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানির একটা বড়ো অংশের ওপর দখল পেয়েছে এবং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে প্রায় একমাত্র কেবল উপনিবেশে, চীনে, যুক্তরাষ্ট্রে ও দক্ষিণ আমেরিকায়। এও সে খেয়াল করে নি যে, এই জার্মানদের সঙ্গে বিদেশে অন্যান্য জার্মানরা ব্যবসা করে ক্রমশ সারা দুনিয়ায় বাণিজ্যিক উপনিবেশের একটা পুরো জাল গড়ে তুলছে। কিন্তু জার্মানি যখন প্রায় চল্লিশ বছর আগে সত্যি করেই রপ্তানির জন্য মাল তৈরি করতে লাগল, তখন শস্য-চালানী দেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর কলওয়ালা দেশরূপে অত অল্প সময়ের মধ্যে তার রূপান্তরে এই বাণিজ্যিক জালটা তার চমৎকার কাজে লেগেছিল। তারপর, প্রায় দশ বছর আগে, বৃটিশ কলওয়ালারা ভয় পেয়ে তার রাষ্ট্রদূত ও কনসালদের প্রশ্ন করে, কেন তাদের খরিদ্দাররা টিকছে না। সকলে একবাক্যে জবাব দেয়: ১) আপনারা খরিদ্দারদের ভাষা শেখেন না, ভাবেন তাদেরই উচিত আপনাদের ভাষায় কথা বলা; ২) খরিদ্দারদের চাহিদা অভ্যাস রুচি ইত্যাদির সঙ্গেও মানিয়ে চলতে চান না, আশা করেন আপনাদের ইংরাজি চাহিদা অভ্যাস রুচি অনুসারেই সে চলবে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

নিজেদের দ্বারাই তৈরি করা এই নির্বাচিত ও সুবিধাভোগী মহলে নিজেদের কেউ যখন প্রবেশাধিকারের যোগ্য বিবেচিত হয়, তখন ভয়ানক সম্মানিত বোধ করে তারা।

সুতরাং, শিল্পজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে ভূমিজীবী অভিজাতদের সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করতে পারার আগেই মঞ্চে আবির্ভূত হল আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী, শ্রমিক শ্রেণী। চার্টিস্ট আন্দোলন ও ইউরোপ ভূখণ্ডের বিপ্লবগুলির পরেকার প্রতিক্রিয়া, তথা ১৮৪৮ — ১৮৬৬ সালের বৃটিশ বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে (স্থূলভাবে বলা হয় একমাত্র অবাধ বাণিজ্যই তার কারণ, তার চেয়েও কিন্তু অনেক বড়ো কারণ রেলপথ, সামুদ্রিক পোত, ও সাধারণভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল বিস্তার) শ্রমিক শ্রেণীকে ফের উদারনৈতিক দলের অধীনে যেতে হয় প্রাক্-চার্টিস্ট যুগের মতো তারা হয় এ দলের র‍্যাডিক্যাল অংশ তাদের ভোটাধিকারের দাবি কিন্তু ক্রমশই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে; উদারনীতিকদের হুইগ নেতারা যে-ক্ষেত্রে 'ভয় পায়' সে-ক্ষেত্রে ডিজরেলি তাঁর শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ দিয়ে টোরিদের (৩১) পক্ষে অনুকূল মুহূর্তটিকে ব্যবহার করে আসনের পুনর্বণ্টন সহ প্রবর্তন করান 'বরো'-গুলিতে ঘর-পিছু ভোট (household suffrage in the boroughs) অতঃপর প্রবর্তিত হয় ব্যালট (৩২); তারপর ১৮৮৪ সালে কাউন্টিগুলিতেও ঘর-পিছু ভোটাধিকারের প্রসার এবং আসনের আরো একটা নববণ্টন যাতে নির্বাচনী এলাকাগুলি কিছুটা সমান সমান হয়ে আসে। এই সব ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর নির্বাচনী ক্ষমতা এতটা বেড়ে যায় যে অন্তত দেড় শ' থেকে দুই শটি নির্বাচনী এলাকায় এ শ্রেণীর লোকেরাই এবার হয় অধিকাংশ ভোটদাতা। কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান শেখানর একটা খাসা ইস্কুল হল পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা; লর্ড জন ম্যানার্স ঠাট্টা করে যাদের বলেছিলেন 'আমাদের সাবেকি অভিজাত' তাদের দিকে মধ্য শ্রেণী যদি তাকায় সভয়সম্ভ্রমে, তাহলে শ্রমিক শ্রেণীও শ্রদ্ধা সম্মান করে তাকাত মধ্য শ্রেণীর দিকে, যাদের অভিহিত করা হত তাদের 'শ্রেয়তর' বলে। বস্তুতপক্ষে, বছর পনের আগে বৃটিশ মজুর ছিল আদর্শ মজুর, মনিবের প্রতিষ্ঠার প্রতি তার সশ্রদ্ধ সম্মান এবং নিজের জন্য অধিকার দাবি করতে তার সংযমী বিনয় দেখে আমাদের ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্ট (৩৩) গোষ্ঠীর জার্মান অর্থনীতিবিদরা তাদের স্বদেশী

মজুরদের দুরারোগ্য কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী প্রবণতার ক্ষেত্রে একটা সান্ত্বনা পেয়েছিল।

কিন্তু ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ভালো ব্যবসায়ী বলে জার্মান অধ্যাপকদের চেয়ে দূরদর্শী। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তারা ক্ষমতা ভাগ করে যে নিয়েছিল তা অনিচ্ছা সহকারে। চার্টিস্ট আন্দোলনের বছরগুলিতে তারা শিখেছে সেই puer robustus sed malitiosus, অর্থাৎ জনগণের সামর্থ্য কেমন। সেই সময় থেকে জনগণের চার্টারের সেরা ভাগটা তারা যুক্তরাজ্যের সংবিধানে সন্নিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এখনই সবচেয়ে বেশি করে জনগণকে শৃঙ্খলায় রাখতে হবে নৈতিক উপায়ে এবং জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারের কার্যকরী সমস্ত নৈতিক উপায়ের মধ্যে প্রথম ও প্রধান উপায় ছিল এবং রয়েই গেল ধর্ম। এই কারণেই স্কুল বোর্ডগুলিতে পাদ্রীদের সংখ্যাধিক্য, এই কারণেই পূজার্চনা থেকে 'স্যালভেশন আর্মি' পর্যন্ত (৩৪) সর্ববিধ পুনরুদয়বাদের (revivalism) সমর্থনে বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান আত্ম-ট্যাক্স।

ইউরোপীয় ভূখণ্ডবাসী বুর্জোয়ার স্বাধীন চিন্তা ও ধর্মীয় শিথিলতার ওপর এবার জিত হল বৃটিশ শালীনতার। ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকেরা বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্রে তারা একেবারে সংক্রামিত এবং যে উপায়ে স্বীয় প্রাধান্য অর্জন করতে হবে, তার বৈধতা নিয়ে তারা, সঠিক কারণেই, বিশেষ ভাবিত ছিল না। এখানকার puer robustus দিন দিন বেশি malitiosus হয়ে উঠছে। বড়াই করে জ্বলন্ত চুরুটটা নিয়ে ডেকের ওপর আসার পর সমুদ্রপীড়ার প্রকোপে ছোকরা যাত্রী যেমন সেটিকে গোপনে ত্যাগ করে, তেমনি ভাবে শেষ পন্থা হিশেবে ফরাসী ও জার্মান বুর্জোয়ার পক্ষে তাদের স্বাধীন চিন্তা নিঃশব্দে পরিত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না; বাইরের ব্যবহারে একের পর এক ধার্মিক হয়ে উঠতে লাগল ঈশ্বরবিদ্বেষীরা, চার্চ এবং তার শাস্ত্রবচন ও অনুষ্ঠানাদির বিষয়ে কথা কইতে লাগল সম্মান করে, যেটুকু না করলে নয় সে সব মেনেও নিতে লাগল। ফরাসী বুর্জোয়ারা শুক্রবার শুক্রবার হবিষ্যি শুরু করল আর রবিবার রবিবার জার্মান বুর্জোয়ারা গির্জায় নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে শুনতে লাগল দীর্ঘ প্রটেস্টাণ্ট সার্মন। বস্তুবাদ নিয়ে তারা বিপদে পড়েছে। 'Die Religion muss dem Volk erhalten werden — ধর্মকে জীইয়ে রাখতে হবে জনগণের জন্য — সমূহ সর্বনাশ

থেকে সমাজের পরিত্রাণের এই হল একমাত্র ও সর্বশেষ উপায়। দুর্ভাগ্যবশত, চিরকালের মতো ধর্মকে চূর্ণ করার জন্য যথাসাধ্য করার আগে এটি তারা আবিষ্কার করতে পারি নি। এবার বিদ্রূপ করে বৃটিশ বুর্জোয়ার বলার পালা: 'আহাম্মকের দল, এ কথা তো দু'শ' বছর আগেই আমি তোমাদের বলতে পারতাম!'

আমার কিন্তু আশঙ্কা, বৃটিশদের ধর্মীয় নিরেটত্ব অথবা ইউরোপ ভূখণ্ডের বুর্জোয়াদের post festum* দীক্ষাগ্রহণ কিছুতেই বর্ধমান প্রলেতারীয় তরঙ্গকে ঠেকাতে পারবে না। ঐতিহ্যের একটা মস্ত পিছুটানের শক্তি আছে, ঐতিহাসের সে vis inertiae**, কিন্তু নিতান্ত নিষ্ক্রিয় বলে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য এবং এই কারণে পুঁজিবাদী সমাজের চিরস্থায়ী রক্ষাকবচ ধর্ম হবে না। আমাদের আইনী, দার্শনিক ও ধর্মীয় ধারণাগুলি যদি হয় একটা নির্দিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কপাতের মোটামুটি দূরের কতকগুলো শাখা তাহলে এই সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সহ্য করে এ সব শাখা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না। এবং অলৌকিক দৈব-প্রত্যয়ে বিশ্বাস না করলে আমাদের মানতেই হবে যে, পতনোন্মুখ সমাজকে ঠেকা দিয়ে রাখার শক্তি কোনো ধর্মীয় প্রবচনের নেই।

বস্তুতপক্ষে ইংলণ্ডেও শ্রমিক শ্রেণী ফের সচল হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই যে, তারা নানাবিধ ঐতিহ্যে শৃঙ্খলিত বুর্জোয়া ঐতিহ্য, যথা এই ব্যাপক-প্রচলিত বিশ্বাস যে, শুধু রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক, মাত্র এই দুটি পার্টিই থাকা সম্ভব এবং শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্তি অর্জন করতে হবে মহান উদারনৈতিক পার্টির সাহায্যে ও তারই মাধ্যমে শ্রমিকদের ঐতিহ্য, যা স্বাধীন সংগ্রামের প্রথম খসড়া প্রচেষ্টা থেকে তারা পেয়েছে, যথা বাধা একটা নিয়মিত শিক্ষানবিশীর মধ্য দিয়ে আসে নি এমন সমস্ত আবেদনকারীকে সাবেকি বহু ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বাদ দিয়ে রাখা; তার অর্থ দাঁড়াবে এই সব ইউনিয়ন কর্তৃক নিজেদের হাতেই নিজেদের বেইমান বাহিনী গঠন করা। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী এগুচ্ছে, ভ্রাতৃপ্রতিম ক্যাথিডার সোশ্যালিস্টদের কাছে এমনকি অধ্যাপক ব্রেনতানোকেও (৩৫) যা রিপোর্ট করতে হয়েছে সখেদে। এগুচ্ছে, ইংলণ্ডের সবকিছুর মতোই, ধীরে ধীরে পা মেপে মেপে, কোথাও দ্বিধা, কোথাও মোটের ওপর অসফল

* পার্বণ পেরিয়ে যাবার পর, অর্থাৎ বিলম্বে। — সম্পাঃ

** জাড্যের শক্তি। — সম্পাঃ

অনিশ্চিত প্রচেষ্টায়: এগুচ্ছে মাঝে মাঝে সমাজতন্ত্র এই নামটার প্রতি এক অতিসতর্ক অবিশ্বাস নিয়ে, সেই সঙ্গে ক্রমশই তার সারবস্তুটিকে আত্মসাৎ করছে সে; এবং এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকদের একটার পর একটা স্তরে বিস্তৃত হচ্ছে লণ্ডন ইস্ট এণ্ডের (৩৬) অনিপুণ মজুরদের তন্দ্রা ঘুচিয়ে দিয়েছে এ আন্দোলন, এবং আমরা সকলেই জানি, প্রতিদানে এই নতুন শক্তিগুলি কী চমৎকার প্রেরণা জুগিয়েছে শ্রমিক শ্রেণীতে। আন্দোলনের গতি যদি কারো অধৈর্যের সমপর্যায়ে না উঠে থাকে তাহলে এ কথা যেন তাঁরা না ভোলেন যে ইংরেজ চরিত্রের সেরা গুণগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রমিক শ্রেণীই, এবং একটা অগ্রসর পদক্ষেপ যদি ইংলণ্ডে একবার অর্জিত হয় তাহলে পরে তা প্রায় কখনো মোছে না। সাবেকি চার্টিস্টদের ছেলেরা যদি পূর্বকথিত কারণে ঠিক বাপকা বেটা হয়ে উঠতে না পেরে থাকে, তবে নাতিরা পূর্বপুরুষদের মান রাখবে বলে আশা করা যায়।

কিন্তু ইউরোপীয় শ্রমিকদের বিজয় শুধু ইংলণ্ডের ওপরেই নির্ভরশীল নয়। সে বিজয় অর্জিত হতে পারে অন্তত ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির সহযোগে। শেষোক্ত দুটি দেশেই শ্রমিক আন্দোলন ইংলণ্ডের চেয়ে বেশ এগিয়ে। জার্মানিতে এমনকি তার সাফল্যের দিন এখন হিসাবের মধ্যেও ধরা যায়। গত পঁচিশ বছরে সেখানে তার যে অগ্রগতি ঘটেছে সেটা অতুলনীয়। ক্রমবর্ধমান গতিতে সে এগুচ্ছে জার্মান মধ্য শ্রেণী যেখানে রাজনৈতিক দক্ষতা শৃঙ্খলা, সাহস, উদ্যোগ, অধ্যবসায়ে শোচনীয় অযোগ্যতা জাহির করেছে, জার্মান শ্রমিক শ্রেণী সেক্ষেত্রে এই সবকটি যোগ্যতারই প্রভূত প্রমাণ দিয়েছে। চারশ' বছর আগে ইউরোপীয় মধ্য শ্রেণীর প্রথম উৎসারের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল জার্মানি; অবস্থা এখন যা, তাতে ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের প্রথম মহান বিজয়ের মঞ্চও হবে জার্মানি, এ কি সম্ভাব্যতার বাইরে?

২০শে এপ্রিল, ১৮৯২.

ফ. এঙ্গেলস

এঙ্গেলসের 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' পুস্তকের ইংরাজি সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত; এ বই লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে, একই সঙ্গে ১৮৯২—১৮৯৩ সালের *Neue Zeit* পত্রিকায় জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়

ইংরাজিতে লিখিত। ১৮৯২ সালের ইংরাজি সংস্করণের পাঠ থেকে বাংলা অনুবাদ

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

১

একদিকে আজকের সমাজের ভেতরে মালিক ও অমালিক, পুঁজিপতি ও মজুরি শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীবৈর, এবং অন্যদিকে উৎপাদনে বিদ্যমান নৈরাজ্য মূলত এরই স্বীকৃতির প্রত্যক্ষ পরিণতি হল আধুনিক সমাজতন্ত্র। কিন্তু তত্ত্বগত আকারে আধুনিক সমাজতন্ত্র কায়ালাভ করে উদিত হয় অষ্টাদশ শতকের মহান ফরাসী দার্শনিকদের বর্ণিত নীতির অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ সম্প্রসারণরূপে। বাস্তব অর্থনৈতিক ঘটনার যতই গভীরে তার মূল নিহিত থাক না কেন, প্রতিটি নতুন তত্ত্বের মতো আধুনিক সমাজতন্ত্রকেও প্রথমে হাতে পাওয়া পূর্বপ্রস্তুত বুদ্ধিমার্গীয় মালমসলার সঙ্গে সংযুক্ত হতে হয়েছিল।

ফরাসী দেশে যে মহাপুরুষেরা আসন্ন বিপ্লবের জন্য মানুষের মন তৈরি করে গেছেন তাঁরা নিজেরাও ছিলেন চরম বিপ্লবী। বাইরেকার কোনো প্রামাণিকতা তাঁরা স্বীকার করেন নি। ধর্ম, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কঠোরতম সমালোচনার লক্ষ্য হয় সবকিছুই; যুক্তির বিচারবেদীর সম্মুখে সবকিছুকেই তার অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে নতুবা অন্তর্হিত হতে হবে সবকিছুর একমাত্র মাপকাঠি হয় যুক্তি হেগেল বলেন, সে সময় বিশ্ব দাঁড়িয়েছিল তার মাথার ওপর*; প্রথমত এই অর্থে যে,

* ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি এই: 'অধিকারের চিন্তা, অধিকারের ধারণা অবিলম্বেই স্বীকৃতি আদায় করে নিল, এর বিরুদ্ধে অন্যায়ের পুরাতন কাঠামো দাঁড়াতে পারল না। সুতরাং, এই অধিকার বোধের ওপর এখন একটা সংবিধানের প্রতিষ্ঠা হল, এখন থেকে সবকিছুরই ভিত্তি হবে তা। সূর্য যবে থেকে আছে আকাশে এবং তাকে ঘিরে ঘুরছে গ্রহ, ততদিনের মধ্যে এ দৃশ্য দেখা যায় নি যে মানুষ দাঁড়াল তার মাথার ওপর অর্থাৎ ভাবনার ওপর এবং বাস্তবকে নির্মাণ করতে লাগল তার এই ভাবনা অনুযায়ী। আনাক্সেইগরস প্রথম বলেছিলেন, *Nous* অর্থাৎ যুক্তির শাসনাধীন দুনিয়া।

মনুষ্য মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রসূত নীতিগুলিই দাবি করে নিজেদেরকেই সর্ববিধ মানবিক কর্ম ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি বলে; কিন্তু ক্রমশ এই ব্যাপকতর অর্থেও যে, যে বাস্তবের সঙ্গে এই নীতির বিরোধ আছে সে বাস্তবকে বস্তুতপক্ষে উল্টে দিতে হবে তদানীন্তন সব ধরনের সমাজ ও সরকারকে, প্রতিটি প্রাচীন ঐতিহ্যগত ধারণাকে অযৌক্তিক বলে নিক্ষেপ করা হয় আস্তাকুঁড়ে। বিশ্ব এযাবৎ কেবল কুসংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছে, যা কিছু অতীত তা সবকিছুই কেবল অনুকম্পা ও ঘৃণার যোগ্য এখন এই প্রথম দেখা দিল দিনের আলো, যুক্তির রাজত্ব; এখন থেকে কুসংস্কার, অবিচার, বিশেষাধিকার, নিপীড়নের জায়গা নেবে শাশ্বত সত্য, শাশ্বত অধিকার, প্রকৃতির ভিত্তি থেকে পাওয়া সাম্য এবং মানবের অলঙ্ঘনীয় অধিকার।

এখন আমরা জানি, যুক্তির এই রাজত্বটা বুর্জোয়ার আদর্শায়িত রাজ্য ছাড়া বেশি কিছু নয়; জানি যে, এই শাশ্বত অধিকার রূপায়ণ লাভ করেছে বুর্জোয়া ন্যায়ে সাম্য পরিণত হয়েছে আইনের চোখে বুর্জোয়া সমানাধিকারে, বুর্জোয়া সম্পত্তি ঘোষিত হয়েছে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার হিশেবে; এবং যুক্তির শাসন, রুসোর (৩৮) 'সামাজিক চুক্তি' বাস্তব হয়েছে এবং বাস্তব হওয়াই সম্ভব কেবল একটা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র রূপে অষ্টাদশ শতকের মহামনীষীদের পক্ষে তাদের পূর্বতনদের মতোই স্বীয় যুগের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু সামন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে বার্গাররা অবশিষ্ট সমাজের প্রতিনিধিত্ব দাবি করছিল তাদের বৈরের পাশাপাশি ছিল শোষক ও শোষিত, নিষ্কর্মা ধনী ও গরিব মজুরদের সাধারণ বৈর। এই পরিস্থিতি ছিল বলেই বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা শুধু একটা বিশেষ শ্রেণী নয়, সমগ্র নিপীড়িত মানবের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের জাহির করতে সমর্থ হয় আগচ। জন্ম থেকেই বুর্জোয়া তার বিপরীত (antithesis) দ্বারা ভারাক্রান্ত মজুরি-

---

কিন্তু এখন এই সর্বপ্রথম মানুষ এই স্বীকৃতিতে পৌঁছল যে, মানসিক বাস্তবতার শাসিত হওয়া উচিত ভাবনার দ্বারা। সে এক অপরূপ অরুণোদয়। সমস্ত চিন্তক সত্তাই এই পবিত্র দিনটির উদ্‌যাপনে অংশ নেয়। একটা অপূর্ব আবেগে তখন আন্দোলিত হয় মানুষ, যুক্তির উদ্দীপনায় বিশ্ব ছেয়ে যায়, এ যেন এল বিশ্বের সঙ্গে ঐশ্বরিক নীতির মিলনের দিন।' (হেগেল, 'ইতিহাসের দর্শন', ১৮৪০, ৫৩৫ পৃঃ)। লোকান্তরিত অধ্যাপক হেগেল কর্তৃক এরূপ অন্তর্ঘাতী ও সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক প্রচারের বিরুদ্ধে সোশ্যালিস্ট-বিরোধী (৩৭) আইনটা অবিলম্বে প্রযোজ্য নয় কি? (এঙ্গেলসের টীকা।)

খাটা শ্রমিক ছাড়া পুঁজিপতির অস্তিত্ব অসম্ভব, এবং গিল্ডের মধ্যযুগীয় বার্গার যে পরিমাণে আধুনিক বুর্জোয়ারূপে বিকশিত হয় সে পরিমাণেই গিল্ডের কর্মী (journeyman) এবং গিল্ডের বাইরেকার দিনমজুরেরা পরিণত হয় প্রলেতারিয়েতে, এবং অভিজাতদের সঙ্গে সংগ্রামে বুর্জোয়ারা যুগপৎ সে-কালের বিভিন্ন মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব মোটের ওপর দাবি করতে পারলেও বড়ো বড়ো প্রত্যেকটা বুর্জোয়া আন্দোলনেই স্বাধীন বিস্ফোরণ ঘটেছে সেই শ্রেণীটির যারা বর্তমান প্রলেতারিয়েতের কমবেশি পরিণত পুরোধা। দৃষ্টান্ত: জার্মান রিফর্মেশন ও কৃষক যুদ্ধের কালে আনাব্যাপটিস্টরা (৩৯) ও টমাস মুনৎসার, মহান ইংরেজ বিপ্লবে লেভেলাররা (৪০), মহান ফরাসী বিপ্লবে বাবেফ।

তখনো অপরিণত একটা শ্রেণীর এই সব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের উপযোগী তাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞাও ছিল: ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থার ইউটোপীয় ছবি (৪১); অষ্টাদশ শতকে সত্যিকার কমিউনিস্টসুলভ তত্ত্ব (মরেলি ও মাব্লি) সাম্যের দাবিটা আর শুধু রাজনৈতিক অধিকারে সীমাবদ্ধ রইল না, তা প্রসারিত হয়ে গেল ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রেও শুধু শ্রেণীগত বিশেষাধিকার উচ্ছেদ নয়, শ্রেণীভেদেরই অবসান করতে হবে। জীবনের সবকিছু উপভোগ বর্জন করে যোগীসুলভ একধরনের স্পার্টান কমিউনিজম হল এই নতুন মতবাদের প্রথম রূপ। এর পর এলেন তিনজন মহান ইউটোপীয়, সাঁ সিমোঁ, তাঁর কাছে প্রলেতারীয় আন্দোলনের পাশাপাশি মধ্য শ্রেণীর আন্দোলনেরও একটা তাৎপর্য ছিল, ফুরিয়ে; এবং ওয়েন — ইনি সেই দেশের লোক যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন সবচেয়ে বিকশিত, তদুদ্ভূত বৈরের প্রভাবে ইনি ফরাসী বস্তুবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ রূপে শ্রেণীভেদ দূর করার জন্য তাঁর প্রস্তাব প্রণয়ন করেন।

একটা কথা তিনজনের ক্ষেত্রেই সমান। ঐতিহাসিক বিকাশ ইতিমধ্যে যে প্রলেতারিয়েতের সৃষ্টি করেছে তার স্বার্থের প্রতিনিধি হয়ে এঁরা কেউ দেখা দেন নি। একটা বিশেষ শ্রেণীর মুক্তি দিয়ে শুরু না করে ফরাসী দার্শনিকদের মতো তাঁরা তৎক্ষণাৎ সমগ্র মানবেরই মুক্তি দাবি করেন। তাঁদের মতোই এঁরাও চান যুক্তি ও শাশ্বত ন্যায়ের রাজত্ব স্থাপন করতে, কিন্তু তাঁরা এই রাজত্বটা যেভাবে দেখেছেন সেটার সঙ্গে ফরাসী দার্শনিকদের আসমান জমিন তফাৎ। কেননা ফরাসী দার্শনিকদের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া জগতটাও আমাদের এই তিন সংস্কারকের কাছে সমান অযৌক্তিক ও অন্যায্য এবং সেই

কারণ, সামন্ততন্ত্র তথা সমাজের পূর্বতন স্তরগুলির মতোই সত্বর আবর্জনারূপে নিক্ষেপনীয়। বিশুদ্ধ যুক্তি ও ন্যায় যদি এযাবৎ দুনিয়াকে শাসন না করে থাকে, তবে তার একমাত্র কারণ, মানুষ তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি। দরকার ছিল শুধু এক প্রতিভাধর ব্যক্তির – এবার তার অভ্যুদয় ঘটেছে, সত্য তার করায়ত্ত। এখন যে তার অভ্যুদয় ঘটল, সত্য যে এখনই পরিষ্কার করে বোঝা গেল, সেটা ঐতিহাসিক বিকাশের গ্রন্থি বেয়ে আসা এক অনিবার্য ব্যাপার নয়, নিতান্তই এক শুভ দৈবঘটনা। পাঁচশ' বছর আগেও তার জন্ম হতে পারত এবং সেক্ষেত্রে মানব সমাজকে পাঁচশ' বছরের ভ্রান্তি সংঘর্ষ ও ক্লেশ ভুগতে হত না।

আমরা দেখেছি, বিপ্লবের পুরোগামী, অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিকেরা বিদ্যমান সবকিছুরই একমাত্র বিচারক বলে আবেদন করে যুক্তির কাছে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটা যুক্তিসিদ্ধ সরকার যুক্তিসিদ্ধ সমাজ; শাশ্বত যুক্তির যা কিছু পরিপন্থী তা সবকিছুকেই নির্মমভাবে বিলোপ করতে হবে। এও দেখেছি যে, আসলে যে অষ্টাদশ শতকের নাগরিক ঠিক সেই সময়টায় বুর্জোয়া হয়ে উঠছিল তারই আদর্শায়িত বোধ ছাড়া এ শাশ্বত যুক্তি আর কিছুই নয়। ফরাসী বিপ্লবে এই যুক্তিসিদ্ধ সমাজ ও সরকার বাস্তব হয়। কিন্তু নতুন ব্যবস্থা আগেকার অবস্থার তুলনায় যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ হলেও মোটেই পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ হয়ে উঠল না। যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ পতন হল। রুসোর 'সামাজিক চুক্তি' বাস্তব রূপ পেয়েছিল 'সন্ত্রাসের শাসনে' (Reign of Terror)। নিজস্ব রাজনৈতিক সামর্থ্যে বুর্জোয়ারা বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল, তারা এ থেকে নিস্তার খুঁজল প্রথমে ডিরেক্টরেটের (৪২ দুর্নীতিপরায়ণতায় এবং শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নীয় স্বৈরাচারের পক্ষপুটে। প্রতিশ্রুত শাশ্বত শান্তি পরিণত হল এক দিগ্বিজয়ের অবিরাম যুদ্ধে। যুক্তিভিত্তিক সমাজের হালও এ থেকে ভালো হল না। এক সাধারণ সম্পন্নতা সৃষ্টি হয়ে ধনী দরিদ্রের বিরোধ মিটে যাবার বদলে তা তীব্রতর হয়ে উঠল গিল্ড প্রভৃতি সুবিধার অপসারণে — এগুলির ফলে এ বিরোধ খানিকটা চাপা ছিল — এবং গির্জার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপে। সামন্ততান্ত্রিক নিগড় থেকে 'সম্পত্তির স্বাধীনতা' অধুনা সত্যই অর্জিত হল এবং ক্ষুদে পুঁজিপতি ও ক্ষুদে কৃষক মালিকদের পক্ষে তা হয়ে দাঁড়াল বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিপুল প্রতিযোগিতায় নিষ্পিষ্ট হয়ে এই সব মহাপ্রভুদের নিকট নিজ নিজ ক্ষুদে সম্পত্তি বিক্রয়ের স্বাধীনতা এবং এই ভাবে, ক্ষুদে

পুঁজিপতি ও কৃষক মালিকদের দিক থেকে, তা হল 'সম্পত্তি থেকে স্বাধীনতা'। পুঁজিবাদী ভিত্তিতে শিল্পের বিকাশের ফলে মেহনতী জনগণের দারিদ্র্য ও ক্লেশই হল সমাজের অস্তিত্বের সর্ত। নগদ টাকা ক্রমশই হয়ে দাঁড়াল, কার্লাইলের বক্তব্য অনুসারে, মানুষে মানুষে একমাত্র সম্পর্ক (sole nexus)। বছরে বছরে বেড়ে উঠল অপরাধের সংখ্যা। আগে সামন্ত পাপাচার প্রকাশ্য দিবালোকে খোলাখুলিই বিহার করতে, এখন তারা উৎপাটিত না হলেও অন্ততপক্ষে পেছনে সরে গিয়েছিল। তার জায়গায় এযাবৎ যা গোপনে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে সেই বুর্জোয়া পাপ আরো সতেজে পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। ব্যবসা ক্রমশই হয়ে দাঁড়াল প্রবঞ্চনা। বিপ্লবী সূত্রবাণীর (৪৩) 'সৌভ্রাত্র' বাস্তবে রূপায়িত হল প্রতিযোগিতা-সংগ্রামের বুজরুকি ও রেষারেষিতে। বলপ্রয়োগে নিপীড়নের জায়গায় এল দুর্নীতি, সমাজ চালাবার প্রথম কলকাঠি হিসেবে তরবারির জায়গা নিল সোনা। প্রথম রাত্রির অধিকার সমস্ত ভূস্বামীদের হাত থেকে গেল বুর্জোয়া কলওয়ালাদের কাছে। গণিকাবৃত্তির বৃদ্ধি ঘটল অভূতপূর্ব রকমের। বিবাহ ব্যাপারটাও আগের মতোই গণিকাবৃত্তির আইনত স্বীকৃত একটা রূপ, আনুষ্ঠানিক একটা আবরণ হয়েই রইল এবং তদুপরি, তার সঙ্গে যুক্ত হল একটা অঢেল ব্যভিচারের স্রোত।

সংক্ষেপে, দার্শনিকদের চমৎকার সব প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তুলনা করলে, 'যুক্তির বিজয়' থেকে উদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল এক তীব্র নৈরাশ্যকর প্রহসন। অভাব ছিল শুধু সে নৈরাশ্যকে সূত্রবদ্ধ করার মতো মানুষের এবং তারা দেখা দিল শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে। ১৮০২ সালে বেরুল সাঁ-সিমোঁর 'জেনেভা পত্রাবলী', ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হল ফুরিয়েরের প্রথম রচনা যদিও তাঁর তত্ত্বের বনিয়াদ গড়ে ওঠে ১৭৯৯ সালেই; ১৮০০ সালের ১লা জানুয়ারি রবার্ট ওয়েন নিউ ল্যানার্কের (৪৪) পরিচালন গ্রহণ করলেন।

এ সময়ে কিন্তু উৎপাদনের পুঁজিবাদী ধরন এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের বৈর তখনো অতি অসম্পূর্ণ বিকশিত। আধুনিক শিল্প সদ্য ইংলণ্ডে শুরু হয়েছে, ফ্রান্সে তা তখনো অজানা। কিন্তু আধুনিক শিল্প একদিকে বাড়িয়ে তোলে এমন সব সংঘাত যাতে উৎপাদনের ধরনে একটা বিপ্লব, তার পুঁজিবাদী চরিত্রের বিলোপ অনিবার্য হয়ে পড়ে — আর এ সব সংঘাত ঘটে কেবল তৎসৃষ্ট শ্রেণীগুলির মধ্যেই নয়, তৎসৃষ্ট উৎপাদন-শক্তি এবং বিনিময় রূপের মধ্যেও। এবং অন্যদিকে, এই অতিকায় উৎপাদন-শক্তির অভ্যন্তরেই তা বিকশিত করে তোলে এ সংঘাতগুলির অবসানের উপায়।

সুতরাং, ১৮০০ সাল নাগাদ নতুন সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সংঘাতগুলি যদি সদ্য আবার নিতে শুরু করে থাকে, তাহলে সে সংঘাত অবসানের উপায়ের ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশি প্রযোজ্য 'সন্ত্রাসের শাসন' কালে প্যারিসের 'সর্বহারা' জনগণ মুহূর্তের জন্য প্রভুত্ব পেয়েছিল এবং তার ফলে বুর্জোয়ার বিপরীতেই বুর্জোয়া বিপ্লবকে তারা বিজয়ী করে দিতে পারে. কিন্তু তাই করতে গিয়ে তারা শুধু এই প্রমাণ করে যে তদানীন্তন অবস্থায় তাদের আধিপত্য টিকে থাকা ছিল কী অসম্ভব. এই 'সর্বহারা' জনগণ থেকে নতুন একটা শ্রেণীর কোষ-কেন্দ্র রূপে তখন সেই প্রথম যারা বিবর্তিত হয়ে উঠেছে সেই প্রলেতারিয়েত তখনো স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মে একেবারেই অক্ষম, তারা দেখা দিয়েছে একটা নিপীড়িত, দুঃখী সম্প্রদায় হিশেবে, আত্ম-সাহায্যে অক্ষম হওয়ায় এই সম্প্রদায়কে যদি সাহায্য পেতে হয় তবে সে সাহায্য আসতে পারে বড়ো জোর বাইরে থেকে, নতুবা উপর থেকে।

এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কবলিত হন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারাও পুঁজিবাদী উৎপাদনের অপরিণত অবস্থা ও অপরিণত শ্রেণী পরিস্থিতির সহগামী হল অপরিণত তত্ত্ব। অবিকশিত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে যা তখনো সুপ্ত তেমন সব সামাজিক সমস্যার সমাধান ইউটোপীয়রা বার করতে চাইল মনুষ্য মস্তিষ্ক থেকে সমাজে অন্যায় ছাড়া আর কিছু নেই. তা দূরীকরণের দায় যুক্তির। সুতরাং, দরকার হল একটা নতুন ও আরো নিখুঁত সমাজব্যবস্থা আবিষ্কার ক'রে তা বাইরে থেকে প্রচারের জোরে এবং যে ক্ষেত্রে সম্ভব সে ক্ষেত্রে আদর্শ পরীক্ষা চালিয়ে বাইরে থেকে তা সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এই নতুন সমাজব্যবস্থাগুলি ইউটোপীয় হতে বাধ্য; যতই সবিস্তারে তাদের পরিপূর্ণ করে রচনা করা হতে লাগল ততই বিশুদ্ধ উৎকল্পনায় ভেসে না গিয়ে তাদের উপায় রইল না

এই কথাগুলো একবার প্রতিষ্ঠার পর প্রশ্নটার এই দিকটা নিয়ে আর কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই — এ এখন সবই অতীতের বিষয়। এই যে সব উৎকল্পনায় আজ আমাদের মাত্র হাসি পায়, তার ওপর সগাম্ভীর্যে ঠোকর মেরে এরূপ 'পাগলামির' তুলনায় নিজেদের নিরাভরণ যুক্তির উৎকর্ষ নিয়ে উল্লাস করার কাজটা আমরা ছেড়ে দিতে পারি সাহিত্যিক চুনো পুঁটিদের। আমাদের কথা ধরলে, আমরা বরং সেই সব মহামহীয়ান ভাবনা ও ভাবনার বীজে আনন্দিত, যা তাঁদের উৎকল্পী আবরণ থেকে সর্বত্রই ফেটে বেরিয়েছে এবং যার প্রতি এই কূপমণ্ডূকেরা অন্ধ।

সাঁ-সিমোঁ মহান ফরাসী বিপ্লবের সন্তান, এ বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন তাঁর বয়স ত্রিবিশও নয়। এ বিপ্লবে জয় হয় তৃতীয় সম্প্রদায়ের অর্থাৎ সুবিধাভোগী অলস শ্রেণীগুলি, অভিজাত ও যাজকদের ওপর — জয় হয় উৎপাদন ও ব্যবসায় যারা খাটছে জাতির সেই বিপুল জনগণের। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিজয় অচিরেই আত্মপ্রকাশ করল এই সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশের স্বীয় বিজয়রূপে, এ সম্প্রদায়ের সামাজিকভাবে সুবিধাভোগী অংশের অর্থাৎ সম্পত্তিমালিক বুর্জোয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতালাভরূপে। বিপ্লবের ভেতর বুর্জোয়ারা নিশ্চিতই দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছিল অভিজাতদের ও গির্জার যে জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে পরে বিক্রির জন্য হাজির করা হয় তার ওপর ফাটকাবাজি করে খানিকটা এবং খানিকটা যুদ্ধ ঠিকার মারফত জাতিকে ঠকিয়ে। এই জুয়াচোরদের আধিপত্যের ফলেই ডিরেক্টরেটের আমলে ফ্রান্স ধ্বংসের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল এবং নেপোলিয়ন অজুহাত পান কুদেতার।

সুতরাং, সাঁ সিমোঁর কাছে তৃতীয় সম্প্রদায় ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যেকার বৈরটা 'কর্মী' ও 'নিষ্কর্মাদের' মধ্যকার একটা বৈর আকারে দেখা দেয়। শুধু সাবেকি সুবিধাভোগী শ্রেণী নয়, উৎপাদন ও বণ্টনে অংশ না নিয়ে যারা তাদের আয়ের ওপর বসে খায় তারা সকলেই নিষ্কর্মা। কর্মীও শুধু মজুরি খাটা শ্রমিক নয়, কলওয়ালা, বণিক, ব্যাঙ্কার - সকলেই নিষ্কর্মারা যে বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের সামর্থ্য হারিয়েছে তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল এবং পাকাপাকি স্থির হয়ে যায় বিপ্লবে। সম্পত্তিহীন শ্রেণীগুলিরও যে সে-সামর্থ্য নেই সেটা সাঁ-সিমোঁর মনে হয়েছিল 'সন্ত্রাসের শাসনের' অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত. তাহলে পরিচালনা করবে, নায়কত্ব করবে কে? সাঁ সিমোঁর মতে তা করবে নতুন একটা ধর্মীয় বন্ধনে মিলিত বিজ্ঞান ও শিল্প, এ ধর্মবন্ধনের নিয়তি হল ধর্মীয় ধ্যানধারণার সেই ঐক্য পুনরুদ্ধার করা যা রিফর্মেশনের সময় থেকে নষ্ট হয়ে গেছে, — অবশ্যই অতীন্দ্রিয়বাদী এবং কড়া রকমের সোপানতান্ত্রিক 'নবখৃষ্টবাদ' বিজ্ঞান অর্থে হল পণ্ডিতবর্গ, এবং শিল্প, সে হল সর্বাগ্রে সক্রিয় বুর্জোয়া, কলওয়ালা, বণিক, ব্যাঙ্কার। সাঁ-সিমোঁর অভিপ্রায় ছিল, এ বুর্জোয়াদের অবশ্যই রূপান্তরিত হতে হবে এক ধরনের জনকর্মচারীতে, সামাজিক অছিরূপে; কিন্তু মজুরদের তুলনায় আধিপত্য ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত একটা অবস্থান তাদের তখনো থাকবে। বিশেষ ক'রে ব্যাঙ্কারদের কাজ হবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ক'রে সমগ্র সামাজিক উৎপাদন

পরিচালিত করা। এ ধারণাটি ঠিক তেমন একটা সময়ের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় যখন ফ্রান্সে আধুনিক শিল্প এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার গহ্বরটা সবে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সাঁ-সিমোঁ বিশেষ জোর যেখানে দেন সেটা এই: সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি তাঁর ভাবনা ছিল সেই শ্রেণীর ভাগ্য নিয়ে যারা সবচেয়ে সংখ্যাধিক ও সবচেয়ে গরিব ('la classe la plus nombreuse et la plus pauvre')

'জেনেভা পত্রাবলী'তেই সাঁ-সিমোঁ প্রস্তাব তুলেছিলেন, 'সমস্ত লোককেই কাজ করতে হবে'। ঐ রচনায় তিনি এ কথাও স্বীকার করেন যে, সন্ত্রাসের শাসন ছিল সম্পত্তিহীন জনগণের শাসন তাদের তিনি বলেছেন, 'দ্যাখো, তোমাদের সাথীরা যখন ফ্রান্সে আধিপত্য করে তখন কী দাঁড়ায়, তারা একটা দুর্ভিক্ষ ঘটায়।' কিন্তু ফরাসী বিপ্লবকে শ্রেণী-যুদ্ধ হিশেবে, শুধু অভিজাত ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার একটা যুদ্ধ নয়, অভিজাত, বুর্জোয়া ও সম্পত্তিহীনদের মধ্যেকার একটা যুদ্ধ হিশেবে চিনতে পারা ১৮০২ সালের পক্ষে একটা অতি অর্থগর্ভ আবিষ্কার ১৮১৬ সালে তিনি ঘোষণা করেন, রাজনীতি হল উৎপাদনের বিজ্ঞান, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক অবস্থা যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ, এ জ্ঞান এখানে মাত্র ভ্রূণাকারে দেখা দিয়েছে। তবু এক্ষেত্রে তখনই যা বেশ পরিষ্কার করে প্রকাশ পেয়েছে সেটা হল এই ধারণা যে, ভবিষ্যতে মানুষের ওপরকার রাজনৈতিক শাসন পরিবর্তিত হবে বস্তুর ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালনায়, অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের বিলোপে', যা নিয়ে ইদানীং এত সোরগোল চলেছে।

সমকালীনদের তুলনায় একই প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় সাঁ-সিমোঁ দেন ১৮১৪ সালে, মিত্রশক্তিদের প্যারিস প্রবেশের ঠিক পরেই, এবং ফের ১৮১৫ সালে একশ' দিনের (৪৫) যুদ্ধের সময় যখন তিনি ঘোষণা করেন, ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের এবং পরে এই দুই দেশের সঙ্গে জার্মানির মৈত্রীই হল ইউরোপের সমৃদ্ধ বিকাশ ও শান্তির একমাত্র গ্যারান্টি। ওয়াটার্লু (৪৬) যুদ্ধের বিজয়ীদের সঙ্গে মৈত্রীর কথা ১৮১৫ সালে ফরাসীদের কাছে প্রচার করতে হলে যেমন সাহস তেমনি ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হ'ত

সাঁ-সিমোঁর মধ্যে যদি পাই একটা এমন পরিপূর্ণ ব্যাপক দৃষ্টি যাতে পরবর্তী সমাজতন্ত্রীদের যে সব ধারণা একান্তভাবে অর্থনৈতিক নয় তার প্রায় সবগুলিই তাঁর মধ্যে ভ্রূণাকারে বর্তমান, তাহলে ফুরিয়ের মধ্যে পাব তদানীন্তন

সমাজব্যবস্থার একটা খাঁটি ফরাসী চালের সরস সমালোচনা, কিন্তু তাই বলে মোটেই তা কম গভীর নয়। ফুরিয়ে বুর্জোয়াকে, তাদের বিপ্লবপূর্বের অনুপ্রেরিত পয়গম্বর আর বিপ্লবোত্তর স্বার্থান্বেষী চাটুকারদের ধরেছেন তাদের স্বমুখনিসৃত উক্তিগুলি দিয়েই। বুর্জোয়া জগতের বৈষয়িক ও নৈতিক দৈন্য তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন নির্মমভাবে। একমাত্র যুক্তি-শাসিত একটা সমাজ, সার্বজনীন সুখের একটা সভ্যতা, মানুষের অসীম একটা পরিপূর্ণতার যে ঝলকিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূর্বতন দার্শনিকেরা এবং তাঁর কালের বুর্জোয়া প্রবক্তারা যে সব রঙীন বুলি আওড়াতেন, তার মুখোমুখি তিনি দাঁড় করিয়ে দেন বুর্জোয়া জগতটাকে। দেখিয়ে দেন কী ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে অতি উচ্চ বাগাড়ম্বরের সঙ্গে সঙ্গে যায় অতি শোচনীয় বাস্তব এবং বুলির এই অপদার্থ তণ্ডুলতাকে তিনি বিধ্বস্ত করেছেন জ্বলাময় ব্যঙ্গে।

ফুরিয়ে শুধু সমালোচক নন; তাঁর অচঞ্চল প্রশান্ত স্বভাব তাঁকে করে তুলেছে ব্যঙ্গবিদ, এবং নিঃসন্দেহে সর্বকালের সেরা ব্যঙ্গবিদদের অন্যতম। যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুন্দর করে তিনি বর্ণনা করেছেন বিপ্লবের পতনের পর যে জুয়াচুরি ফাটকাবাজির মহোৎসব শুরু হয়, সে সময়কার ফরাসী বাণিজ্যের মধ্যে এবং তারই বৈশিষ্ট্যসূচক যে দোকানদারি মনোবৃত্তি তখন প্রচলিত, তার কথা। এর চেয়েও তাঁর ওস্তাদি নরনারী সম্পর্কের বুর্জোয়া রূপ এবং বুর্জোয়া সমাজে নারীর যে স্থান, তাঁর সমালোচনায় তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে, কোনো একটা সমাজের সাধারণ মুক্তির স্বাভাবিক মাপকাঠি হল সে সমাজে নারী মুক্তির মান।

কিন্তু সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বোধের ক্ষেত্রেই ফুরিয়ে মহত্তম। এযাবৎ সমাজের সমগ্র ধারাকে তিনি ভাগ করেছেন বিবর্তনের চারটি পর্যায়ে – বন্যতা, বর্বরতা, পিতৃতন্ত্র, সভ্যতা। শেষেরটি হল আজকের তথাকথিত সভ্য বা বুর্জোয়া সমাজ অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী থেকে যে সমাজব্যবস্থা শুরু হয়েছে তিনি প্রমাণ করেন, 'বর্বরতার যুগে যে পাপের অনুষ্ঠান হত সরলভাবে তাদের সবকটিকেই একটা জটিল দ্ব্যর্থক দুমুখো ভণ্ডামির অস্তিত্বে উন্নীত করা হয়েছে সভ্য যুগে'; সভ্যতার গতি একটা 'পাপ চক্রে'র মধ্য দিয়ে, বিরোধের মধ্য দিয়ে যা সে ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছে অথচ তার সমাধানে অক্ষম; সুতরাং, যা তার অভিপ্রেত অথবা অভিপ্রেত বলে ভান করে ঠিক তার বিপরীতেই সে ক্রমাগত উপনীত হচ্ছে, ফলে দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সভ্যতার আমলে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হচ্ছে অতি প্রাচুর্যের মধ্য থেকেই'।

দেখা যাচ্ছে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে ফুরিয়ে ঠিক তাঁর সমকালীন হেগেলের মতোই নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। একই দ্বান্দ্বিকতার ব্যবহার করে তিনি সীমাহীন মানবিক উন্নয়নের বিরুদ্ধে তর্ক তুলেছেন, বলেছেন, প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক পর্যায়েরই যেমন উত্থান তেমনি অবতরণের যুগ বর্তমান, এবং এই সত্যকে প্রয়োগ করেছেন সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে। পৃথিবীর শেষ পরিণাম ধ্বংস, এই ধারণাটি ক্যাণ্ট যেমন আমদানি করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ফুরিয়েও তেমনি ইতিহাস বিজ্ঞানে চালু করেন মনুষ্য জাতির শেষ ধ্বংসের ধারণা।

ফ্রান্সের মাটির ওপর দিয়ে যখন বিপ্লবের ঝড় বয়ে গিয়েছিল, তখন ইংলণ্ডে চলছিল একটা শান্ততর বিপ্লব, যদিও তাই বলে সেটা কম প্রচণ্ড নয়। বাষ্প এবং নতুন নতুন যন্ত্র তৈরির সবক্ষামে হস্তশিল্প কারখানা (manufacture) পরিবর্তিত হচ্ছিল আধুনিক শিল্পে এবং এই ভাবে বিপ্লব ঘটাচ্ছিল বুর্জোয়া সমাজের সমগ্র ভিত্তিমূলেই। কারখানা পর্বের বিকাশের ঢিমেতেতালা গতি পরিণত হল উৎপাদনের একটা সত্যকার ঝটিকাবর্তে। নিয়ত বর্ধমান ক্ষিপ্রতায় চলল বৃহৎ পুঁজিপতি ও নির্বৃত্ত প্রলেতারিয়েতে সমাজের ভাঙন তাদের মাঝখানে, আগেকার স্থিতিশীল মধ্য শ্রেণীর বদলে কারুশিল্পী ও ক্ষুদে দোকানদারদের একটা টলমলে জনপুঞ্জ, জনসংখ্যার সবচেয়ে অস্থির একটা অংশ, কষ্টে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলল।

উৎপাদনের নয়া পদ্ধতি তখন সবে তার উত্থান পর্বের শুরুতে মাত্র, তখনো পর্যন্ত সেটা উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মিত একটা পদ্ধতিই বটে, তদানীন্তন অবস্থায় সম্ভবপর একমাত্র পদ্ধতি। তাহলেও, তখনই তা থেকে বিপুল সামাজিক অবিচারের সৃষ্টি হয়ে চলেছে — বড়ো বড়ো শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সব মহল্লায় গৃহহীন জনতার ভিড়, চিরাচরিত সবকিছু নৈতিক বাঁধন, পিতৃতান্ত্রিক বাধ্যতা, পারিবারিক সম্পর্কের শৈথিল্য; একটা ভয়ঙ্কর মাত্রার অতি মেহনত, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বেলায়; গ্রাম থেকে শহরে, কৃষি থেকে আধুনিক শিল্পে, জীবন ধারণের স্থির অবস্থা থেকে দিন দিন পরিবর্তমান একটা অনিশ্চিত অবস্থায়, একেবারে নতুন একটা পরিস্থিতির মধ্যে সহসা নিক্ষিপ্ত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর পরিপূর্ণ হতাশা।

এই সন্ধিক্ষণে সংস্কারক হিশেবে এগিয়ে এলেন ২৯ বছর বয়সের এক কারখানা-মালিক, প্রায় অনির্বচনীয় শিশুসুলভ একটা সারল্য তাঁর চরিত্রে, অথচ সেই সঙ্গেই যে মুষ্টিমেয়রা জন-নায়ক হয়েই জন্মায় তাদের একজন।

রবার্ট ওয়েন বস্তুবাদী দার্শনিকদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যথা· মানুষের চরিত্র হল একদিকে বংশগতি এবং অন্যদিকে মানুষের জীবন কালের, বিশেষ করে তার বিকাশ-কালের পরিবেশের ফল তাঁর শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দেখেছিল কেবল গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা, আর ঘোলা জলে মাছ ধরে দ্রুত প্রভূত টাকা করার সুবিধা। রবার্ট ওয়েন দেখলেন তাঁর প্রিয় তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে শৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ। ম্যাঞ্চেস্টারের একটা কারখানায় পাঁচ শতাধিক লোকের সুপারিন্টেন্ডেণ্ট হিশেবে এটা তিনি আগেই সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। ১৮০০ থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত তিনি স্কটল্যাণ্ডের নিউ ল্যানার্কে পরিচালক অংশীদার হিশেবে একটি বৃহৎ সুতাকলের কাজ চালান সেই একই পদ্ধতিতে, কিন্তু অধিকতর স্বাধীনতা নিয়ে এবং এতটা সাফল্যের সঙ্গে যে ইউরোপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে যারা ছিল অতি হরেক রকমের একটা দঙ্গল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি নীতিভ্রষ্ট সব লোক, এবং ধীরে ধীরে যাদের সংখ্যা বেড়ে ওঠে ২,৫০০-এ, এমন একটা জনতাকে তিনি রূপান্তরিত করেন এক আদর্শ লোকালয়ে, যেখানে মাতলামি, পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট, মোকদ্দমা, দীন আইন (poor laws), ভিক্ষাদান প্রভৃতি ছিল অজানা। এবং তা করেন নেহাৎ লোকগুলোর জন্য একটা মানুষের যোগ্য পরিস্থিতি রচনা ক'রে এবং বিশেষ ক'রে, উঠতি ছেলেমেয়েদের সযত্নে লালন ক'রে। শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয়ের তিনিই প্রবর্তক, নিউ ল্যানার্কে প্রথমটি তিনি চালু করেন। দুই বছর বয়স থেকে ছেলেরা আসত বিদ্যালয়ে, সেখানে তারা এতই আনন্দে থাকত যে, বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়া দায় হত। ওয়েনের প্রতিযোগীরা যে ক্ষেত্রে মজুর খাটাত দিন তের চোদ্দ ঘণ্টা ক'রে, সে ক্ষেত্রে নিউ ল্যানার্কে কাজের দিন ছিল মাত্র সাড়ে দশ ঘণ্টা তুলোর একটা সংকটে যখন চার মাসের জন্য কাজ বন্ধ থাকে, তখনো তাঁর মজুরেরা পুরো মজুরি পেয়ে এসেছে এবং এ সব সত্ত্বেও কারবারের মূল্য দ্বিগুণের বেশি বাড়ে, শেষ পর্যন্ত তা মোটা মুনাফা জুগিয়েছে মালিকদের।

তা সত্ত্বেও ওয়েনের তৃপ্তি ছিল না। তাঁর মজুরদের জন্য তিনি অস্তিত্বের যে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন সেটা তাঁর চোখে তখনো মানুষের যোগ্য নয়। 'লোকগুলো আমার করুণানির্ভর ক্রীতদাস।' অপেক্ষাকৃত অনুকূল যে পরিস্থিতিতে তাদের তিনি বসিয়েছেন তাতে চরিত্রের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সর্বাঙ্গীন ও যুক্তিসিদ্ধ বিকাশ তখনো হচ্ছিল না, তাদের যোগ্যতার অবাধ অনুশীলন তো আরো কম। 'অথচ এই আড়াই হাজার অধিবাসীর মেহনতী

অংশটা রোজ সমাজের জন্য যে পরিমাণ বাস্তব সম্পদ সৃষ্টি করছে তা করতে অর্ধশতকেরও কম আগে দরকার হত ছয় লক্ষ অধিবাসীর মেহনতী অংশের নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ছয় লক্ষ লোক যে সম্পদ ভোগ করত, সে থেকে এই আড়াই হাজার লোক যা ভোগ করছে তা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকা উচিত সেটা গেল কোথায়?'*

জবাবটা পরিষ্কার. তা গেছে তিন লক্ষ পাউণ্ডের ছাঁকা মুনাফা ছাড়াও কারখানার স্বত্বাধিকারীদের লগ্নী মূলধনের ওপর ৫% পরিশোধ করতে। আর নিউ ল্যানার্কের পক্ষে যেটা খাটে, তা আরো বেশি খাটে ইংলণ্ডের সমস্ত ফ্যাক্টরি সম্পর্কেই। 'অযথার্থরূপে প্রযুক্ত হলেও যন্ত্র কর্তৃক এই নতুন সম্পদ যদি না সৃষ্টি হত, তাহলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এবং সমাজের অভিজাত প্রথাকে সমর্থনের জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধগুলি চালান যেত না। অথচ এই নতুন শক্তি শ্রমিক শ্রেণীরই সৃষ্টি'** এ নতুন শক্তির ফল ভোগের অধিকার সুতরাং তাদেরই. নবসৃষ্ট অতিকায় উৎপাদন-শক্তি এযাবৎ যা ব্যক্তিবিশেষকে ধনী করা ও জনগণকে গোলাম করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তা থেকে ওয়েন পেলেন সমাজ পুনর্নির্মাণের ভিত্তি; সকলের সাধারণ সম্পত্তি হিশেবে এগুলির নির্বন্ধ হল সকলের সাধারণ মঙ্গলের জন্য চালিত হওয়া

বলা যেতে পারে, ব্যবসায়িক হিসাবের পরিণতিস্বরূপ এই বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বনিয়াদের ওপরেই ওয়েনের কমিউনিজমের ভিত্তি। আগাগোড়া তাঁর এই ব্যবহারিক চরিত্র বজায় থেকেছে। এই ভাবে, ১৮২৩ সালে ওয়েন কমিউনিস্ট উপনিবেশ স্থাপন করে আয়র্ল্যাণ্ডের দুর্দশা ত্রাণের প্রস্তাব তোলেন এবং তা প্রতিষ্ঠার খরচা, বাৎসরিক ব্যয় ও সম্ভাব্য আয়ের পুরো হিসাব ছকে দেন। ভবিষ্যতের জন্য সুনির্দিষ্ট তাঁর পরিকল্পনায় খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এমন ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে, ভিতের নকসা, সামনের পাশের উপরের পাখি-আঁখি দৃশ্য সব সমেত যে, সমাজ সংস্কারের ওয়েন পদ্ধতি একবার গ্রহণ করলে তার প্রত্যক্ষ খুঁটিনাটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপত্তি করার প্রায় জো নেই।

---

* 'মনে ও আচরণে বিপ্লব' শীর্ষক একটি স্মারকলিপি থেকে, ২১ পৃষ্ঠা, এটি বণ্টিত হয় 'ইউরোপের সমস্ত রেড রিপাবলিকান, কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের' উদ্দেশে এবং ১৮৪৮ সালের ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকারে এবং 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁর দায়িত্বশীল উপদেষ্টাদের' নিকট প্রেরিত হয়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** ঐ, পৃঃ ২২। (এঙ্গেলসের টীকা।)

কমিউনিজমের অভিমুখে পদক্ষেপ করায় জীবনের মোড় ফিরে গেল ওয়েনের যতদিন তিনি মাত্র মানবহিতৈষী ততদিন কেবল ধনসম্পদ, সাধুবাদ, সম্মান ও গৌরবের পুরস্কার মিলেছে তাঁর। তিনি ছিলেন ইউরোপের সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি। শুধু স্বশ্রেণীর লোকেরাই নয়, রাষ্ট্রনেতারা, এমনকি রাজন্যেরাও তাঁর কথা শুনত সপ্রশংসায়. কিন্তু যখন তিনি তাঁর কমিউনিস্ট তত্ত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন, তখন সে তো আলাদা কথা ওয়েনের মনে হয়েছিল সমাজ সংস্কারের পথ রোধ করে আছে তিনটি বৃহৎ প্রতিবন্ধক: ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্ম ও বর্তমানের বিবাহ প্রথা। জানতেন, এদের আক্রমণ করলে কী তাঁর ভাগ্যে আছে অবৈধীকরণ, সরকারী সমাজ থেকে বহিষ্কার, সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠার অবসান। কিন্তু এর কোনোটাই ফলাফলের তোয়াক্কা না করে সে আক্রমণ থেকে তাঁকে বিরত করতে পারে নি; এবং যা ভেবেছিলেন তাই ঘটল। সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে নীরবতার চক্রান্ত সমেত সরকারী সমাজ থেকে নির্বাসিত হয়ে, আমেরিকায় তাঁর অসফল কমিউনিস্ট পরীক্ষায় নিজের সমস্ত সম্পদ যা ঢেলেছিলেন সে সব খুইয়ে তিনি ফিরলেন সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর দিকে, তাদের মধ্যেই কাজ করে যান তিরিশ বছর। ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে প্রত্যেকটা সামাজিক আন্দোলন, প্রত্যেকটি সত্যকার অগ্রগতির সঙ্গে রবার্ট ওয়েনের নাম জড়িত। পাঁচ বছর সংগ্রামের পর, ১৮১৯ সালে তিনি ফ্যাক্টরিতে নারী ও শিশুদের কাজের ঘণ্টা সীমাবদ্ধ করার আইন জোর করে পাশ করিয়ে নেন (৪৭)। ইংলণ্ডের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন যখন একটা বৃহৎ একক বৃত্তি সমিতিতে (৪৮) ঐক্যবদ্ধ হয় তবেই প্রথম কংগ্রেসে তিনি সভাপতিত্ব করেন সমাজের পরিপূর্ণ কমিউনিস্ট সংগঠনের আগে উৎক্রমণ ব্যবস্থা হিশেবে তিনি একদিকে প্রবর্তন করেন খুচরা ব্যবসা ও উৎপাদনের জন্য সমবায় সমিতি। সেদিন থেকে অন্তত এই ব্যবহারিক প্রমাণ এগুলি দিয়ে এসেছে যে, সমাজের দিক থেকে বণিক ও কলওয়ালারা নিতান্ত অনাবশ্যক. অন্যদিকে তিনি প্রবর্তন করেন মেহনত-নোট মারফত মেহনতের ফল বিনিময়ের জন্য মেহনতী বাজার, এই মেহনত-নোটের একক ধরা হয় এক ঘণ্টার কাজ (৪৯), প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্ফল হতে বাধ্য ছিল কিন্তু অনেক পরবর্তী কালের প্রুধোঁর বিনিময় ব্যাঙ্কের (৫০) প্রকল্পটা আগে থেকেই পুরোপুরি আন্দাজ করা হয় এতে, — শুধু এই তফাৎ যে একেই সমাজের সর্ব অকল্যাণের মহৌষধ বলে জাহির না করে বলা হয়েছে সমাজের অধিকতর একটা আমূল বিপ্লবের দিকে তা এক প্রথম পদক্ষেপ মাত্র.

ইউটোপীয় চিন্তাধারা উনিশ শতকের সমাজতন্ত্রী ধ্যান ধারণাকে দীর্ঘকাল প্রভাবিত করে এসেছে এবং এখনো কিছু কিছু করছে। এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত ফরাসী ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রীরা সকলেই তার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করে এসেছে। ভাইৎলিং-এর কমিউনিজম সমেত আগেকার জার্মান কমিউনিজমও ওই একই পন্থার পথিক। এদের সকলের কাছেই সমাজতন্ত্র হল পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায়ের প্রকাশ, আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র নিজের শক্তিতেই তা বিশ্বজয় করবে। এবং পরম সত্য যেহেতু দেশ কাল ও মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশ নিরপেক্ষ, তাই কখন কোথায় সেটা আবিষ্কৃত হবে সেটা মাত্র দৈবের ঘটনা। তা সত্ত্বেও এক একটা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতার কাছে পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় এক একরকম। এবং প্রত্যেকের এই বিশেষ প্রকারের পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় যেহেতু তার সাবজেকটিভ বোধ, জীবন ধারণের অবস্থা, জ্ঞানের বহর ও বুদ্ধিমার্গীয় অনুশীলন দ্বারা নির্ধারিত, সেই হেতু পরম সত্যগুলির সংঘাতের শুধু এইটে ছাড়া অন্য পরিণাম অসম্ভব যে, সেগুলি হবে একান্তরূপে পরস্পর পৃথক। এ থেকে শুধু এক ধরনের পাঁচমিশালী গড়পড়তা সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বেরবে না এবং বস্তুতপক্ষে তাই আজও পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী-শ্রমিকদের মন আচ্ছন্ন করে আছে। সেই জন্যই জগাখিচুড়ি বেঁধে চলতে দেওয়া হয় মতামতের বহুবিধ সব প্রকার ভেদকে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাদের এমন সব সমালোচনী বিবৃতি, অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ সমাজ চিত্রের জগাখিচুড়ি, যাতে বিরোধিতা জাগবে সবচেয়ে কম; বিতর্কের স্রোতে এক-একটা উপাদানের সুনির্দিষ্ট তীক্ষ্ন ধারগুলো যতই নদীর গোল গোল নুড়ির মতো মসৃণ হয়ে উঠবে, সে জগাখিচুড়িও সেদ্ধ হয়ে উঠবে ততই সহজে।

সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে আগে তাকে স্থাপন করা দরকার বাস্তব ভিত্তির ওপর।

২

ইতিমধ্যেই অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দর্শনের পাশাপাশি এবং তার পরে দেখা দিয়েছে নতুন জার্মান দর্শন, যার পরিণতি হেগেলে। এ দর্শনের সবচেয়ে বড়ো গুণ হল যুক্তির উচ্চতম ধরন হিশেবে দ্বান্দ্বিকতার পুনঃপ্রবর্তন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা সকলেই ছিলেন স্বভাবদ্বান্দ্বিক এবং এঁদের

মধ্যেকার সবচেয়ে বিশ্বকোষিক মনীষা অ্যারিস্টটল দ্বান্দ্বিক চিন্তার সবচেয়ে মৌলিক রূপগুলির বিশ্লেষণ আগেই করে গেছেন। অন্যপক্ষে, নবতর দর্শনের মধ্যে যদিও দ্বান্দ্বিকতার চমৎকার প্রবক্তারাও ছিলেন (যথা, দেকার্ত, স্পিনোজা), তবু বিশেষ করে ইংরেজদের প্রভাবে তা ক্রমেই তথাকথিত অধিবিদ্যক (মেটাফিজিক্যাল) যুক্তিপ্রকরণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতকের ফরাসীরাও তার দ্বারা প্রায় পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়, অন্ততপক্ষে তাদের যে রচনা বিশেষ করে দার্শনিক লেখগুলির ক্ষেত্রে। সংকীর্ণ অর্থে যা দর্শন তার বাইরে ফরাসীরা কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার সেরা কীর্তি রচনা করেছেন দিদেরোর *Le Neveu de Rameau* ('রামোর ভাইপো') এবং রুসোর *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* ('মানুষের মধ্যে অসাম্যের উদ্ভব') স্মরণ করলেই যথেষ্ট। এ দুই চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক।

সাধারণ নিসর্গ বা মানুষের ইতিহাস কিংবা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়াকলাপ যখন আমরা লক্ষ্য করি ও তাই নিয়ে ভাবি, তখন সর্বপ্রথমে যে ছবিটা আমাদের চোখে পড়ে, তাতে দেখি সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়ার, অসংখ্য বিনিময় (permutations) ও সংযুক্তির (combinations) অন্তহীন বিজড়ন, যেখানে কিছুই যা ছিল, যেখানে ছিল এবং যেমন ছিল তা থাকে না সবকিছুই সরে যায়, বদলায়, উদ্ভূত হয় ও লোপ পায়। সুতরাং প্রথমে আমরা ছবিটা দেখি সমগ্রভাবে, তার আলাদা আলাদা অংশগুলো তখনো মোটের ওপর থাকে পশ্চাৎপটে; এগুচ্ছে, সংযুক্ত হচ্ছে, সম্পর্কিত হচ্ছে যে বস্তুগুলো তাদের বদলে লক্ষ্য পড়ে বরং গতির ওপর, রূপান্তরের ওপর, সম্পর্কপাতের ওপর। বিশ্বের এই প্রাথমিক, সহজ-সরল কিন্তু মূলত সঠিক বোধটা হল প্রাচীন গ্রীক দর্শনের বোধ এবং তা প্রথম পরিষ্কার করে সূত্রবদ্ধ করেন হেরাক্লিটস: সবকিছুই আছে তবু নেই, কারণ সবকিছুই প্রবহমান নিয়ত পরিবর্তমান, নিয়তই তার উদ্ভব ও অন্তর্ধান।

কিন্তু ঘটনাবলীর এই ছবির সাধারণ চরিত্র সমগ্রভাবে সঠিক প্রকাশ করলেও যে সব খুঁটিনাটি অংশ দিয়ে এ ছবি তৈরি তার ব্যাখ্যার দিক থেকে এ বোধ অপ্রতুল, এবং যতক্ষণ এই সব খুঁটিনাটি আমরা না বুঝছি ততক্ষণ গোটা ছবিটার পরিষ্কার ধারণা হতে পারে না। এই খুঁটিনাটিগুলো বুঝতে হলে প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে এনে তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করতে হবে, বিচার করতে হবে তার প্রকৃতি, বিশেষ

কারণ ফলাফল ইত্যাদি। মূলত এ কাজ প্রকৃতিবিজ্ঞানের ও ঐতিহাসিক গবেষণার; এগুলি বিজ্ঞানের এমন শাখা যা ক্লাসিক যুগের গ্রীকেরা সুযুক্তিতেই একটা গৌণ জায়গায় ঠেলে রেখেছিল কারণ এ বিজ্ঞান যা নিয়ে কাজ করবে তার মালমশলা সংগ্রহ করতে হবে আগে। কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক মালমশলা সংগ্রহ করার আগে কোনো বিচারমূলক বিশ্লেষণ, তুলনা, এবং শ্রেণী, ধারা ও প্রজাতিরূপে তার বিন্যাস হতে পারে না। যথাযথ প্রকৃতিবিজ্ঞানের (exact natural sciences) ভিত্তি তাই প্রথম রচিত হয় আলেকজেন্দ্রীয় যুগের (৫১) গ্রীক এবং পরে মধ্য যুগে, আরবদের দ্বারা। সত্যকারের প্রকৃতিবিজ্ঞানের সূত্রপাত পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং তদবধি নিয়ত বর্ধমান দ্রুততায় তা এগিয়ে গেছে। আলাদা আলাদা অংশে প্রকৃতির বিশ্লেষণ, সুনির্দিষ্ট বর্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও বস্তুর সন্নিবেশ, বহুবিধ রূপের জৈব বস্তুর আভ্যন্তরীণ শারীরস্থান অধ্যয়ন — গত চারশ' বছরে প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান যে অতিকায় পদক্ষেপে এগিয়েছে তার মূল সর্ত ছিল এইগুলি. কিন্তু কাজের এই পদ্ধতি থেকে প্রাকৃতিক বস্তু ও প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা, বিপুল সমগ্রটা থেকে তাকে সম্পর্কচ্যুত করে দেখার একটা অভ্যাসও আমরা ঐতিহ্য হিশেবে পেয়েছি; তাদের দেখা গতির মধ্যে নয় স্থিতির মধ্যে মূলত পরিবর্তমান বস্তু হিশেবে নয়. স্থির বস্তু হিশেবে, জীবনের মধ্যে নয়, মরণের মধ্যে। বেকন ও লক কর্তৃক এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যখন প্রকৃতিবিজ্ঞান থেকে দর্শনে আনীত হল, তখন তা থেকে দেখা দিল গত শতকের বৈশিষ্ট্যসূচক সংকীর্ণ অধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা।

যিনি অধিবিদ্যক (metaphysician) তাঁর কাছে বস্তু ও তার মানসিক প্রতিচ্ছবি, ভাবনাদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাদের বিচার করতে হবে একে একে, পরস্পর থেকে আলাদাভাবে অনুসন্ধান বস্তু হিশেবে এগুলি স্থির অনড় ও চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট। অধিবিদ্যকের চিন্তা একান্তরূপে দুরপনেয় বিপরীতের (antithesis) ধারায়, তাহার বাণী, 'ইতি ইতি বা নেতি নেতি, কারণ ইহার অতিরিক্ত যাহা তাহা আসিতেছে শয়তানের নিকট হইতে।' তাঁর কাছে একটা বস্তু হয় আছে, নয় নেই। একটা বস্তু একই কালে সেই বস্তু ও অন্য বস্তু হতে পারে না। ইতি ও নেতি পরস্পরকে নাকচ করে; কার্য ও কারণের মধ্যে অনড় বৈপরীত্য বর্তমান

প্রথম দৃষ্টিতে এ ধরনের চিন্তা আমাদের কাছে ভারি ভাস্বর লাগে, কারণ এ হল তথাকথিত পাকা সাধারণ বুদ্ধির কথা। কিন্তু নিজের চার দেয়ালের

ঘরোয়া রাজত্বে পাকা সাধারণ বুদ্ধিটাকে বেশ ভদ্রস্থ দেখালেও যেই সে গবেষণার প্রশস্ত দুনিয়ায় পা বাড়ায়, অমনি অতি আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানার মধ্যে পড়তে হয় তাকে। অধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা যদিও কতকগুলি ক্ষেত্রে সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়, নির্দিষ্ট বিচার্য বস্তুটির প্রকৃতি অনুসারে সে ক্ষেত্রের আয়তন বদলায়, — কিন্তু তাহলেও, আজ হোক, কাল হোক, তা একটা সীমায় পৌঁছয়, যার বাইরে গেলেই তা একপেশে সীমাবদ্ধ বিমূর্ত হয়ে পড়ে, সমাধানহীন বিরোধের মধ্যে পথ হারায় আলাদা আলাদা বস্তুর বিচারে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা সে ভুলে যায়, অস্তিত্বের বিচারে ভুলে যায় সে অস্তিত্বের শুরু ও শেষের কথা, স্থিতির বিচারে ভোলে গতি; গাছ দেখে, দেখে না অরণ্য।

যেমন দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে আমরা জানি ও বলতে পারি, একটা প্রাণী জীবিত কি মৃত কিন্তু খুঁটিয়ে বিচারের পর দেখা যাবে যে বহু ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা অতি জটিল, আইনজ্ঞরা তা ভালোই জানেন। মাতৃগর্ভে কোন যুক্তিসিদ্ধ সীমার পর শিশুকে হত্যা করলে সেটা খুন হবে, তা আবিষ্কার করতে তাঁরা বৃথাই মাথা ঠুকেছেন। মৃত্যুর একটা যথাযথ মুহূর্ত নির্ধারণ করাও সমান অসম্ভব, কেননা শারীরবৃত্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যু একটা তাৎক্ষণিক, মুহূর্তের ঘটনা নয়, অতি দীর্ঘায়িত একটা প্রক্রিয়া।

একই ভাবে, প্রতিটি জৈব সত্তাও প্রতিমুহূর্তেই সেই একই সত্তা আবার সে সত্তা নয়ও; প্রতিমুহূর্তে তা বাইরে থেকে পদার্থ আত্মস্থ করছে এবং অন্য পদার্থ পরিত্যাগ করছে; প্রতি মুহূর্তে তার দেহের কোনো কোষের মৃত্যু হচ্ছে, কোনো কোষের জন্ম হচ্ছে; দীর্ঘ বা স্বল্প কালের মধ্যে তার দেহের পদার্থ সম্পূর্ণ নবায়িত হয়ে উঠছে. তার স্থান নিচ্ছে পদার্থের অন্য পরমাণু. ফলে প্রত্যেকটা জৈব সত্তাই সর্বদাই সেই বটে তবু সে নয়

অপিচ, গভীরতর অনুসন্ধানে দেখা যায় যে বিপরীতের (antithesis) দুই মেরু অর্থাৎ সদর্থক ও নঞর্থক প্রান্তদুটি যে পরিমাণ পরস্পরবিরোধী সেই পরিমাণেই অবিচ্ছেদ্য, এবং যতকিছু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট একই ভাবেই দেখা যায়, কার্য ও কারণ রূপ বোধগুলি শুধু বিচ্ছিন্ন এক একটা ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেই তবে খাটে. কিন্তু এই আলাদা আলাদা ঘটনাগুলি যেই সামগ্রিক বিশ্বের সঙ্গে সাধারণ সম্পর্কের মধ্যে বিবেচিত হয়, তখনই তারা পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তা তালগোল পাকিয়ে যায় যখন সেই বিশ্বজনীন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবি, যেখানে

কার্য ও কারণ নিয়ত স্থান পরিবর্তন করে চলেছে, ফলে একটা ক্ষেত্রে ও একটা মুহূর্তে যা কার্য অন্য ক্ষেত্রে ও অন্য মুহূর্তে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় কারণ, তেমনি আবার কারণও হয়ে দাঁড়ায় কার্য।

আধিবিদ্যক যুক্তির কাঠামোর মধ্যে এই সব প্রক্রিয়া ও ভাবনা-ধারার কোনোটাই আঁটে না। পক্ষান্তরে, দ্বান্দ্বিকতায় বস্তু ও তার প্রতিচ্ছবি, ভাবনা অনুধ্যেয় মূল সম্পর্ক, গ্রন্থিপরম্পরা, গতি, উদ্ভব ও অবসানের মধ্যে। উপরে যে সব প্রক্রিয়ার কথা বলা হল তা তার স্বীয় কর্মপদ্ধতিরই কতকগুলি সমর্থন।

দ্বান্দ্বিকতার প্রমাণ হল প্রকৃতি, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়ে বলতেই হবে যে, দিন দিন বর্ধমান অতি মূল্যবান মালমশলা দিয়ে এ প্রমাণ সে দাখিল করে চলেছে এবং দেখিয়েছে যে, শেষ বিচারে, প্রকৃতির ক্রিয়া আধিবিদ্যামূলক নয়, দ্বন্দ্বমূলক; নিয়ত পুনরাবৃত্ত একই বৃত্ত পথে চিরকাল সে চলে না, সত্যকার একটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই তার যাত্রা। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ডারউইনের। প্রকৃতির আধিবিদ্যক বোধের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ডতম আঘাত হানেন এইটে প্রমাণ করে যে, সমস্ত জৈব সত্তা, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং স্বয়ং মানুষ কোটি কোটি বছরের এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। কিন্তু দ্বান্দ্বিকভাবে চিন্তা করতে শিখেছেন এমন প্রকৃতিবিদের সংখ্যা খুবই কম, এবং তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধুনা যে অশেষ বিভ্রান্তি বর্তমান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, রচয়িতা ও পাঠক সকলের মধ্যেই যে সমান হতাশা দেখা যাচ্ছে, তার কারণ হল চিন্তার পূর্বাভ্যস্ত ধরনের সঙ্গে আবিষ্কৃত ফলাফলগুলির এই সংঘাত।

তাই বিশ্বের, তার বিবর্তনের, মানবজাতির বিকাশের এবং মনুষ্যমনে এ বিবর্তনের যে প্রতিফলন, তার সঠিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে কেবল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে, যাতে জীবন ও মৃত্যুর, অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী পরিবর্তনের অসংখ্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতি অবিরাম লক্ষ্য রাখা হয়। নতুন জার্মান দর্শন এই প্রেরণাতেই এগিয়েছে। বিখ্যাত সেই প্রাথমিক অভিঘাত (impulse) একবার পাবার পর নিউটনের যে সৌরমণ্ডলী অবিচল ও চিরস্থায়ী তাকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায়, ঘূর্ণ্যমান বাষ্পস্তূপ (nebulous mass) থেকে সূর্য ও গ্রহাদির সৃষ্টিতে পরিণত করে ক্যান্ট তাঁর কর্ম শুরু করেন তা থেকে তিনি সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত টানেন যে, সৌরমণ্ডলের এই যদি উৎপত্তি হয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ মৃত্যুও অনিবার্য। অর্ধ শতাব্দী পরে তাঁর তত্ত্ব গাণিতিকভাবে নিষ্পন্ন করেন লাপ্লাস, এবং তারও অর্ধ শতাব্দী পর বর্ণালী

যন্ত্র (spectroscope) প্রমাণ করে যে, মহাশূন্যে ঘনীভবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই ধরনের ভাস্বর বাষ্পপুঞ্জ বর্তমান।

নতুন এই জার্মান দর্শন পরিণতি পেল হেগেলের তন্ত্রে। এ তন্ত্রে, এবং এইটেই তার বড়ো গুণ — এই সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, বুদ্ধিমার্গীয়, সমগ্র বিশ্বই উপস্থাপিত হল একটা প্রক্রিয়ারূপে অর্থাৎ, অবিরত গতি, পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিকাশরূপে; এবং এই সমস্ত গতি ও বিকাশ যাতে একটা অখণ্ড সমগ্র হয়ে উঠছে সেই অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সন্ধানের চেষ্টা হল। কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংসাকর্মের এক উদ্দাম ঘূর্ণাবর্ত, পরিণত দার্শনিক বুদ্ধির কাছে যার প্রতিটি কর্মই সমান নিন্দার্হ এবং যতশীঘ্র ভোলা যায় ততই ভালো, এ ভাবে প্রতিভাত না হয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গির কাছে মনুষ্য ইতিহাস প্রতিভাত হল মানুষেরই বিবর্তনের এক প্রক্রিয়ারূপে। নানান পথের মধ্যে দিয়ে এ প্রক্রিয়ার ক্রমপ্রগতি অনুসরণ করা ও বাহ্যত আকস্মিক সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তার আভ্যন্তরীণ নিয়মটিকে বার করার কাজ এবার বুদ্ধির।

যে সমস্যা উপস্থিত করা হল তার সমাধান যে হেগেলীয় তন্ত্র দেয় নি, সে কথা এখানে অবান্তর। এবং যুগান্তকারী কীর্তি হল এই যে সমস্যাটিকে তা বিবৃত করেছে। এ সমস্যা এমন যে, কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে তার সমাধান দেওয়া অসম্ভব সাঁ-সিমোঁর মতো হেগেল যদিও তৎকালের এক অতি বিশ্বকোষিক মনীষা, তথাপি প্রথমত, তাঁর স্বীয় জ্ঞানের অনিবার্য সীমাবদ্ধ প্রসারে এবং তাঁর যুগের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার সীমাবদ্ধ প্রসার ও গভীরতায় তিনি সীমিত। এই সীমাবদ্ধতার সঙ্গে তৃতীয় একটি সীমার কথাও যোগ করতে হবে হেগেল ছিলেন ভাববাদী। তাঁর কাছে তাঁর মস্তিষ্কমধ্যস্থ ভাবনাগুলি সত্যকার বস্তু ও প্রক্রিয়ার ন্যূনাধিক বিমূর্ত চিত্র নয়, বরং উল্টো, বিশ্বেরও পূর্বে অনাদি কাল থেকে কোথায় যেন অবস্থিত এক 'ভাবের' (Idea) বাস্তবীভূত চিত্রই হল এই বস্তু ও তার বিবর্তন। এ ধরনের চিন্তায় সবকিছুই একেবারে উল্টো করে দাঁড় করানো হয় এবং বিশ্বের ভেতরকার বস্তুসমূহের আসল সম্পর্কটাকে একেবারে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় আলাদা আলাদা বহু ঘটনাসমষ্টি সঠিকভাবে ও সপ্রতিভায় হেগেল হৃদয়ঙ্গম করলেও সদ্যবর্ণিত কারণে খুঁটিনাটিতে তাতে অনেক কিছুই রয়ে গেছে যা জোড়াতালি, কৃত্রিম, টেনেবুনে করা, অর্থাৎ ভুল। হেগেলীয় তন্ত্রটা এমনিতে একটা বিপুল গর্ভপাত, তবে এ জাতের গর্ভপাত এই শেষ। বস্তুতপক্ষে একটা অন্তর্নিহিত ও

অনপনোদনীয় বিরোধিতায় তা পীড়িত একদিকে তার মূল কথা হল এই বোধ যে মানবিক ইতিহাস একটা বিবর্তন প্রক্রিয়া সুতরাং তার প্রকৃতিবশেই কোনো তথাকথিত পরম সত্য আবিষ্কারই তার বুদ্ধিমার্গীয় শেষ কথা হতে পারে না। অথচ অন্যদিকে নিজেকে এই পরম সত্যেরই মূলাধার বলে তা দাবি জানায় প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের এই দর্শনতন্ত্র যা সবকিছুকে বিধৃত করছে ও চিরকালের মতো চূড়ান্ত হয়ে থাকছে, এটা দ্বান্দ্বিক যুক্তির মূল নিয়মেরই বিরোধী। বহির্বিশ্বের নিয়মিত জ্ঞান যে যুগে যুগে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে, এ কথা এ নিয়মে বস্তুতপক্ষে মোটেই নাকচ হয় না, বরং সেইটাই ধরে নেওয়া হয়।

জার্মান ভাববাদের এই মৌলিক স্ববিরোধের বোধ থেকে অনিবার্যই প্রত্যাবর্তন ঘটল বস্তুবাদে কিন্তু, nota bene, নেহাৎ সেই আধিবিদ্যক, অষ্টাদশ শতকের একান্তরূপের যান্ত্রিক বস্তুবাদে নয়। সাবেকি বস্তুবাদের চোখে সমস্ত অতীত ইতিহাস ছিল অযৌক্তিকতা ও জোর-জুলুমের এক কদাকার স্তূপ; আধুনিক বস্তুবাদ তার ভেতর দেখে মানবসমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়া এবং সে বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারই তার লক্ষ্য। অষ্টাদশ শতকের ফরাসীদের কাছে, এমনকি হেগেলের কাছেও, সমগ্রভাবে প্রকৃতির যা বোধ সেটা এই যে, তা সংকীর্ণ, চিরকালের মতো অপরিবর্তনীয় চক্রে ঘূর্ণ্যমান, গ্রহ তারা সব চিরন্তন যা শিখিয়েছিলেন নিউটন, এবং তার জীব প্রজাতির নড়চড় নেই — যা শিখিয়েছিলেন লিনিয়স। আধুনিক বস্তুবাদ ধারণ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধুনাতন আবিষ্কারগুলিকে, তাতে ধরা হয় যে প্রকৃতিরও একটা কালগত ইতিহাস আছে, গ্রহ তারাগুলিরও জন্মমৃত্যু হচ্ছে যেমন জন্মমৃত্যু হচ্ছে জৈব প্রজাতিগুলির, যারা অনুকূল পরিস্থিতিতে বাস নিয়েছে এই সব গ্রহ তারাতে। এবং সমগ্রভাবে প্রকৃতি যদি বা পুনরাবৃত্ত চক্রেই আবর্তিত বলে এখনো পর্যন্ত ধরতে হয়, তাহলেও এ চক্রের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে সীমাহীনরূপে। দুদিক থেকেই আধুনিক বস্তুবাদ মূলত দ্বান্দ্বিক; রাণীর মতো বিজ্ঞানের অবশিষ্ট প্রজাদের ওপর প্রভুত্ব করার দাবিদার কোনো একটা দর্শনের প্রয়োজন তার আর নেই। বিশেষ বিশেষ প্রত্যেকটি বিজ্ঞানই যতই বস্তুর এবং আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের বিপুল সামগ্রিকতার মধ্যে নিজ নিজ অবস্থান পরিষ্কার করে নিতে বাধ্য, ততই এই সামগ্রিকতা নিয়ে একটা বিশেষ বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় অবান্তর নতুবা অনাবশ্যক। পূর্বতন সমস্ত দর্শনের মধ্য থেকে যেটুকু টিকে থাকে তা হল চিন্তা ও তার নিয়মের বিজ্ঞান —

যুক্তি প্রকরণ (formal logic) ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব। বাকি সবকিছুই প্রকৃতি ও ইতিহাসের বাস্তব বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

অবশ্য, প্রকৃতি বিষয়ক বোধে বিপ্লব যদিও হওয়া সম্ভব কেবল তদুপযোগী গবেষণালব্ধ সুনির্দিষ্ট মালমশলার অনুপাতে, তাহলেও বেশ আগেই এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল যাতে ঐতিহাসিক বোধের ক্ষেত্রে একটা চূড়ান্ত পরিবর্তন আসে। ১৮৩১ সালে প্রথম শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে লিয়োঁ-তে, ১৮৩৮—১৮৪২ সালের মধ্যে প্রথম জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন, ইংরেজ চার্টিস্টদের আন্দোলন শীর্ষে আরোহণ করে। একদিকে আধুনিক শিল্প এবং অন্যদিকে বুর্জোয়ার নবার্জিত রাজনৈতিক প্রাধান্য যে অনুপাতে বিকাশ পায় সেই অনুপাতে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম পুরোভাগে আসতে থাকে ইউরোপের অতি অগ্রসর দেশগুলির ইতিহাসে। পুঁজি ও মেহনতের সমস্বার্থ, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ সার্বজনীন সামঞ্জস্য ও সার্বজনীন সমৃদ্ধি — বুর্জোয়া অর্থনীতির এই সব শিক্ষাকে ক্রমেই সজোরে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিতে লাগল ঘটনা। এ সব ব্যাপারকে আর উপেক্ষা করা চলে না, যেমন উপেক্ষা করা চলে না তাদের তাত্ত্বিক, যদিও অতি অপরিণত প্রকাশ — ফরাসী ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রকে। কিন্তু ইতিহাসের পুরনো ভাববাদী যে ধারণা তখনো অপসৃত হয় নি, তার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে শ্রেণী-সংগ্রামের কোনো জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান ছিল না অর্থনৈতিক স্বার্থের; উৎপাদন তথা সর্ববিধ অর্থনৈতিক সম্পর্ক তার কাছে কেবল 'সভ্যতার ইতিহাসের' আনুষঙ্গিক গৌণ ঘটনা মাত্র।

নতুন তথ্যগুলির ফলে সমস্ত অতীত ইতিহাসের একটা নতুন বিচার আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। তখন দেখা গেল, আদিম পর্যায়গুলি বাদে সমস্ত অতীত ইতিহাসই হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস; সমাজের এই যুধ্যমান শ্রেণীগুলিও সর্বদাই উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতি অর্থাৎ তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার ফল; সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা থেকেই আসছে আসল বনিয়াদ, যা থেকে শুরু করে আমরা একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের আইনী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা তার ধর্মীয়, দার্শনিক ও অন্যবিধ ভাবধারার সমগ্র উপরিকাঠামোর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বার করতে পারি। ইতিহাসকে হেগেল মুক্ত করেছিলেন অধিবিদ্যা থেকে, তাকে তিনি দ্বান্দ্বিক করে তোলেন; কিন্তু তাঁর ইতিহাস বোধ ছিল মূলত ভাববাদী। এবার কিন্তু ভাববাদ বিতাড়িত হল তার শেষ আশ্রয়, ইতিহাসের দর্শন থেকে; এবার প্রবর্তিত হল ইতিহাসের

একটা বস্তুবাদী ব্যাখ্যান; এযাবৎকাল যা হত সেভাবে মানুষের 'সত্তাকে' তার 'জ্ঞান' দিয়ে ব্যাখ্যা না করে জ্ঞানকে' তার 'সত্তা' দিয়ে ব্যাখ্যা করার একটা পদ্ধতি পাওয়া গেল।

সে সময় থেকে সমাজতন্ত্র আর কোনো না কোনো প্রতিভাবান মস্তিষ্কের আকস্মিক আবিষ্কার নয়। তা হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এই দুই ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত শ্রেণীর ভেতরকার সংগ্রামের আবশ্যিক পরিণাম। যথাসম্ভব নিখুঁত একটা সমাজের বিধান বানানো আর নয়, তার কাজ হল সেই ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা অনুধাবন করা যা থেকে এই শ্রেণীগুলো ও তাদের বৈরের অনিবার্য উদ্ভব ঘটেছে এবং এই ভাবে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সে সংঘাত দূরীকরণের উপায় বার করা। কিন্তু ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে আগের কালের সমাজতন্ত্রের ততটাই গরমিল যতটা গরমিল দ্বান্দ্বিকতা ও আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ফরাসী বস্তুবাদীদের প্রকৃতিবিষয়ক বোধের। আগের কালের সমাজতন্ত্র অবশ্যই উৎপাদনের প্রচলিত পুঁজিবাদী পদ্ধতি ও তার ফলাফলের সমালোচনা করেছে। কিন্তু সেটাকে তা ব্যাখ্যা করতে পারে নি সুতরাং এর ওপর প্রাধান্য লাভ করা ছিল তার অসাধ্য। সম্ভব ছিল শুধু মন্দ বলে এগুলিকে বর্জন করা। পুঁজিবাদের আমলে যা অনিবার্য শ্রমিক শ্রেণীর সেই শোষণকে এই পূর্বতন সমাজতন্ত্র যতই সজোরে ধিক্কার দিতে থাকল ততই এ কথা পরিষ্কার করে বোঝাতে সে অক্ষম হয়ে উঠল, কীসে সেই শোষণ, কী ভাবে তার উদ্ভব। কিন্তু সে জন্য দরকার ছিল (১) পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে তার ঐতিহাসিক সম্পর্কের মধ্যে দেখানো, একটা বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে তার অনিবার্যতা এবং সেই হেতু তার অনিবার্য পতনের কথাও উপস্থিত করা, এবং (২) তার মূল চরিত্র উদ্ঘাটন করা, তা তখনো সংগুপ্ত। এ কাজ নিষ্পন্ন হল বাড়তি মূল্যের আবিষ্কারে। দেখানো হল যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তদধীনে শ্রমিক শোষণের ভিত্তি হল দাম-না-দেওয়া শ্রমের আত্মসাৎ, বাজার থেকে পুঁজিপতি যদি শ্রমশক্তিকে পণ্য হিশেবে তার পুরো দাম দিয়েই কেনে, তাহলেও সে যে দাম দিচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য নিষ্কাশিত করে নেয়, এবং শেষ বিশ্লেষণে এই বাড়তি মূল্য থেকেই সেই মূল্য-সমষ্টির সৃষ্টি যা দিয়ে মালিক শ্রেণীগুলির হাতে জমে উঠছে ক্রমবর্ধমান পুঁজির স্তূপ। পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং পুঁজির উৎপাদন উভয়েরই সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা গেল।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ এবং বাড়তি মূল্য মারফত পুঁজিবাদী উৎপাদনের রহস্য উদ্ঘাটন, এই দুই বিরাট আবিষ্কারের জন্য আমরা মার্কসের কাছে ঋণী। এই আবিষ্কারগুলির ফলে সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল বিজ্ঞান। পরের কাজ হল তার সব কিছু খুঁটিনাটি ও সম্পর্কপাত বিস্তারিত করে তোলা।

৩

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের শুরু এই কথা থেকে যে মনুষ্যজীবনের ভরণ-পোষণের উপায়ের উৎপাদন এবং তৎপরে উৎপাদিত বস্তুর বিনিময় — এই হল সমস্ত সমাজ কাঠামোর ভিত্তি, এবং ইতিহাসে আবির্ভূত প্রতিটি সমাজের ধনবণ্টনের ধরন এবং শ্রেণী ও বর্গে সমাজের বিভাগ নির্ভর করে কী উৎপাদন হল, কী ভাবে উৎপাদিত হল এবং কী ভাবে উৎপন্নের বিনিময় হল, তার ওপর। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের অন্তিম কারণের সন্ধান করতে হবে মানুষের মস্তিষ্কে নয়, চিরন্তন সত্য ও ন্যায় নির্ণয়ে কোনো ব্যক্তির উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে নয়, উৎপাদন-পদ্ধতি ও বিনিময়ের ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে। তার সন্ধান করতে হবে দর্শনের মধ্যে নয়, প্রতি যুগের অর্থনীতির মধ্যে। প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অযৌক্তিক ও অন্যায়, যুক্তি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে অ-যুক্তি এবং ন্যায় অ-ন্যায়,* তা কেবল এই প্রমাণ করে যে, উৎপাদন-পদ্ধতিতে ও বিনিময়ের ধরনে অলক্ষ্যে এমন পরিবর্তন ঘটে গেছে যাতে পূর্বতন অর্থনৈতিক অবস্থার উপযোগী সমাজব্যবস্থাটা আর খাপ খাচ্ছে না। তা থেকে আরো দাঁড়ায় যে, উদ্ঘাটিত বৈষম্য থেকে ত্রাণের উপায়ও এই পরিবর্তিত উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যেই ন্যূনাধিক বিকশিত অবস্থায় থাকতে বাধ্য। মূল সব নীতি থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে সে উপায়গুলো উদ্ভাবনীয় নয়, সেগুলো উদ্ঘাটন করতে হবে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার কঠোর সত্যগুলির মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজতন্ত্রের অবস্থান তাহলে কী?

এ কথা এখন সকলেই বেশ মানেন সমাজের বর্তমান ব্যবস্থা আজকের শাসক শ্রেণী বুর্জোয়ার সৃষ্টি। বুর্জোয়ার বৈশিষ্ট্যসূচক উৎপাদন-পদ্ধতি, মার্কসের সময় থেকে যা উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি বলে পরিচিত তা

* গ্যেটের 'ফাউস্ট', ১ম ভাগ, ৪র্থ দৃশ্য (ফাউস্টের কক্ষ) — সম্পাঃ

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে, ব্যক্তি বিশেষ, গোটাগুটি এক একটা সামাজিক বর্গ ও স্থানীয় সঙ্ঘের জন্য সামন্ততন্ত্র যে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে তার সঙ্গে তথা সামন্ততন্ত্রের যা সামাজিক কাঠামো সেই বংশগত অধীনতা সম্পর্কের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। বুর্জোয়ারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে তার ধ্বংসের ওপর বানাল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা — অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমস্ত পণ্য মালিকদের সমানাধিকার ইত্যাদি পুঁজিবাদী আশীর্বাদের রাজত্ব। তখন থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি স্বাধীনভাবে বিকাশ পেতে পারল। বাষ্প, যন্ত্র এবং যন্ত্র তৈরির যন্ত্র যখন থেকে পুরনো কারখানাকে (manufacture) আধুনিক শিল্পে রূপান্তরিত করে, তখন থেকে বুর্জোয়াদের পরিচালনায় উৎপাদন-শক্তি এমন দ্রুততর ও এমন মাত্রায় বেড়েছে যা অশ্রুতপূর্ব। কিন্তু তার নিজের যুগে পুরনো কারখানা, এবং সে কারখানার প্রভাবে অধিকতর বিকশিত হস্তশিল্প যেমন গিল্ডের সামন্ত শৃঙ্খলের সঙ্গে সংঘাতে আসে, ঠিক তেমনি আধুনিক শিল্প তার পরিপূর্ণতর বিকাশে এবার সংঘাতে আসছে সেই সব সীমার সঙ্গে যার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি তাকে আটকে রাখছে। উৎপাদন শক্তিকে ব্যবহার করার পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে নতুন উৎপাদন শক্তি. এবং উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-পদ্ধতির এই সংঘাতটা আদিম পাপ বনাম স্বর্গীয় ন্যায়ের মতো একটা সংঘাত নয়, যার উদ্ভব মানুষের মনে। সত্য ঘটনা হিশেবে, বাস্তবে আমাদের বাইরে, এমনকি যে লোকগুলি এ সংঘাত সৃষ্টি করেছে তাদের অভিপ্রায় ও কর্মের অপেক্ষা না রেখেই এ সংঘাত বর্তমান। আধুনিক সমাজতন্ত্র আর কিছুই নয় — বাস্তব ক্ষেত্রের এই সংঘাতের প্রতিফলন ভাবনার ক্ষেত্রে; প্রত্যক্ষভাবে যে শ্রেণী তাতে পীড়িত সর্বাগ্রে সেই শ্রমিক শ্রেণীর মানসে সে সংঘাতের এক আদর্শ প্রতিচ্ছবি।

কী নিয়ে এই সংঘাত?

পুঁজিবাদী উৎপাদনের পূর্বে অর্থাৎ মধ্য যুগে উৎপাদনের উপায় মেহনতীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এই ভিত্তিতে ক্ষুদে শিল্পের ব্যবস্থাই ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত; গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাস বা স্বাধীন ক্ষুদে চাষীর কৃষিব্যবস্থা, শহরে গিল্ডের হস্তশিল্প। শ্রমের সরঞ্জাম — ভূমি, কৃষি-যন্ত্র, কর্মশালা, হাতিয়ারপত্র ছিল এক একজনের একক শ্রমের সরঞ্জাম, শুধু একজন শ্রমিকের ব্যবহারেরই তা উপযোগী এবং সেই কারণে স্বভাবতই তা ছিল ক্ষুদ্র, বামনাকার ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঠিক এই জন্যই সাধারণত উৎপাদকই ছিল তার

মালিক। উৎপাদনের এই বিক্ষিপ্ত, স্বল্প উপায়গুলিকে পুঞ্জীভূত করা, পরিবর্ধিত করা, আধুনিক উৎপাদনের প্রবল হাতিয়ারে পরিণত করা — এইটেই ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ও তার প্রবক্তা বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। 'পুঁজি' গ্রন্থের চতুর্থ অংশে মার্কস বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কী ভাবে সরল সমবায়, কারখানা ও আধুনিক শিল্প, এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে তা ঐতিহাসিকভাবে রূপায়িত হয়ে এসেছে ১৫শ শতক থেকে। তাতে আরো দেখানো হয়েছে যে, উৎপাদনের এই সব ক্ষুদে ক্ষুদে উপায়গুলিকে যুগপৎ ব্যক্তির উৎপাদন-উপায় থেকে একমাত্র সমষ্টিগতভাবে পরিচালনীয় সামাজিক উৎপাদন-উপায়ে পরিণত না করে বুর্জোয়ারা সেগুলোকে শক্তিশালী উৎপাদন-শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারত না। চরকা, তাঁত, কামারের হাতুড়ির জায়গায় এল বয়ন-যন্ত্র, শক্তি-চালিত তাঁত, বাষ্প চালিত হ্যামর; ব্যক্তিগত কর্মশালার জায়গায় এল ফ্যাক্টরি যাতে শত শত, হাজার হাজার মজুরের সহযোগ প্রয়োজন। একই ভাবে, উৎপাদন ব্যাপারটাই একসারি ব্যক্তিগত কর্ম থেকে পরিবর্তিত হল একসারি সামাজিক কর্মে এবং উৎপন্ন দ্রব্য পরিবর্তিত হল ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যে। ফ্যাক্টরি থেকে এবার যে সুতো, যে কাপড় যে ধাতু দ্রব্যাদি বেরিয়ে আসতে লাগল তা হল বহু শ্রমিকের মিলিত উৎপাদন, যা পর পর বহু শ্রমিকের হাত ঘুরে এসে তবে তৈরি হয়েছে। কোনো একটা লোক এ কথা বলতে পারত না, 'এটা আমি তৈরি করেছি; এটা আমার মাল।'

কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো একটা সমাজে যেখানে উৎপাদনের মূল ধরনটা হল শ্রমের এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিভাগ যা কোনো পূর্বপরিকল্পিত ছকের ওপর নয় এমনিই ধীরে ধীরে এসে পড়েছে, সেখানে উৎপন্নও পণ্যের রূপ নেয়, এ পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়ে, বেচা-কেনায় ব্যক্তিগত উৎপাদক তার বহুবিধ চাহিদা মেটাতে পারে। এই ছিল মধ্য যুগের অবস্থা। যেমন, কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করত হস্তশিল্পীর কাছে এবং তার কাছ থেকে কিনত হস্তশিল্পজাত সামগ্রী। ব্যক্তিগত উৎপাদক, পণ্য উৎপাদকদের এই সমাজে চেপে বসল নতুন উৎপাদন-পদ্ধতি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বিনাই যা গড়ে উঠেছিল এবং সমগ্র সমাজ যার ওপর চলত সেই পুরনো শ্রম-বিভাগের ভেতর এবার এল একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে শ্রমবিভাগ, যেমন ফ্যাক্টরিতে; ব্যক্তিগত উৎপাদনের পাশাপাশি আবির্ভূত হল সামাজিক উৎপাদন — দুধরনের উৎপাদনই একই বাজারে বিক্রয় হত, সুতরাং

অন্তত মোটের ওপর সমান সমান দামে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমবিভাগের চেয়ে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সংগঠন প্রবলতর। সমষ্টিবদ্ধ ব্যক্তির সংযুক্ত সামাজিক শক্তি নিয়ে কাজ চালানো ফ্যাক্টরিগুলি ব্যক্তিগত ক্ষুদে উৎপাদকদের চেয়ে পণ্য-উৎপাদন করতে লাগল অনেক শস্তায়। শাখার পর শাখায় হার মানতে লাগল ব্যক্তিগত উৎপাদন। সমাজীকৃত উৎপাদন উৎপাদনের সমস্ত পুরনো পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটাল কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিপ্লবী চরিত্রটা এতই কম পরিজ্ঞাত ছিল যে, তা প্রবর্তিত হয় উল্টে বরং পণ্য-উৎপাদনের বৃদ্ধি ও বিকাশের উপায় হিশেবে. উদ্ভবের সময় তা পণ্য-উৎপাদন ও বিনিময়ের কতকগুলি তৈরি ব্যবস্থা পেয়েছিল এবং তা ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়, যথা বণিক পুঁজি, হস্তশিল্প মজুরি-শ্রম। সমাজীকৃত উৎপাদন এই ভাবে পণ্য-উৎপাদনের একটা নবরূপ হিশেবে প্রবর্তিত হওয়ায় অবধারিতভাবেই তার মধ্যে দখলীকরণের পুরনো রূপগুলো পুরো বজায় থাকে এবং তার উৎপন্নের ক্ষেত্রেও তা প্রযুক্ত হয়.

পণ্য উৎপাদনের বিবর্তনের মধ্যযুগীয় স্তরে শ্রমোৎপন্ন বস্তুর মালিক কে, সে প্রশ্ন উঠতেও পারে নি। নিজেরই কাঁচামাল — সাধারণত তা তার নিজেরই তৈরি তাই থেকে ব্যক্তিগত উৎপাদক নিজের হাতিয়ারপত্র দিয়ে, নিজের বা পরিবারের মেহনতে তা উৎপন্ন করত। উৎপন্ন বস্তুটা দখল করার কোনো প্রয়োজন উৎপাদকের ছিল না অবধারিতভাবেই তা ছিল পুরোপুরি তারই জিনিস। সুতরাং, উৎপন্ন বস্তুর উপর তার মালিকানার ভিত্তি হল তার নিজ শ্রম। যে ক্ষেত্রে বাইরের সাহায্য ব্যবহৃত হত, সেখানেও সাধারণত তার গুরুত্ব থাকত কম, এবং প্রায়শই মজুরি ছাড়া অন্য জিনিস দিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়া হত। গিল্ডের শিক্ষানবিস ও কর্মীরা কাজ করত ভরণ-পোষণ ও মজুরির জন্য ততটা নয়, যতটা শিক্ষার জন্য, নিজেরাই যাতে তারা ওস্তাদ হয়ে উঠতে পারে সেই জন্য।

তারপর শুরু হল বড়ো বড়ো কর্মশালা ও কারখানায় উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদকদের পুঞ্জীভবন, প্রকৃতই সমাজীকৃত উৎপাদন উপায় ও সমাজীকৃত উৎপাদক হিশেবে তাদের রূপান্তর. কিন্তু সমাজীকৃত উৎপাদক এবং উৎপাদন-উপায় ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্য এ পরিবর্তনের পরেও ঠিক আগের মতোই বিবেচিত হতে লাগল অর্থাৎ ধরা হতে থাকল ব্যক্তিগত উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্য রূপে। এযাবৎকাল মেহনতী সরঞ্জামের মালিকই উৎপন্ন দ্রব্যের দখল নিয়েছে কেননা সাধারণত ওটা তারই উৎপন্ন, অন্যের সাহায্যটা ব্যতিক্রম।

এবার মেহনতী সরঞ্জামের মালিকই উৎপন্ন দ্রব্য দখল করতে থাকল, যদিও এটা এখন তার উৎপন্ন নয়, একান্তরূপে অন্যের মেহনত থেকে উৎপন্ন। এই ভাবে, সামাজিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের দখল পেল না তারা, যারা সত্যিই উৎপাদনের উপায়কে চালু করেছে, যারা সত্যিই পণ্য-উৎপাদন করেছে, দখল পেল পুঁজিপতিরা। উৎপাদনের উপায় তথা উৎপাদনটাই মূলত সমাজীকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু এমন একটা দখলীকরণ প্রথার তা অধীন রইল যাতে এক এক জনের ব্যক্তিগত উৎপাদন স্বীকৃত এবং সেই হেতু প্রত্যেকেই ছিল তার নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক এবং তা বাজারে আনত। এই রকমের দখলের অধীন হল উৎপাদন-পদ্ধতি, যদিও এ দখলের যে শর্ত তার উচ্ছেদ করে দিয়েছে তা।*

এই স্ববিরোধটাই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতিকে পুঁজিবাদী চরিত্র দান করেছে এবং তার মধ্যেই আজকের সমগ্র সামাজিক বৈরের বীজ নিহিত উৎপাদনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এবং সমস্ত উৎপাদনশীল দেশে এই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতির আধিপত্য যতই বাড়ছে, যতই তা ব্যক্তিগত উৎপাদনকে এক নগণ্য হতাবশেষে পরিণত করেছে, ততই পরিষ্কার করে ফুটে উঠেছে সমাজীকৃত উৎপাদনের সঙ্গে পুঁজিবাদী দখলের অসামঞ্জস্য।

আগেই বলেছি, প্রথম পুঁজিপতিরা বাজারে অন্যান্য রূপের শ্রমের সাথে সাথে মজুরি-শ্রমও পায় তৈরি অবস্থায়। কিন্তু সে ছিল ব্যতিরেকমূলক, অনুপূরক, সহায়ক, অস্থায়ী মজুরি-শ্রম কৃষি-মেহনতি কখনো কখনো বা দিনমজুর হিশেবে খাটলেও কয়েক একর নিজস্ব জমি তার ছিল, যাই ঘটুক না কেন, তা থেকে দুমুঠো জোগাড় করতে পারত সে। গিল্ডগুলির সংগঠন ছিল এমন যে, আজ যে জোগাড়ে কাল সে হত ওস্তাদ। কিন্তু উৎপাদনের উপায় সমাজীকৃত ও পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ সবকিছু

---

* দখলের রূপ একই থাকলেও তার চরিত্রে উপরি বর্ণিত কারণে উৎপাদনের মতোই সমান একটা বিপ্লব যে ঘটে যায় তা এ প্রসঙ্গে দেখানোর তেমন প্রয়োজন নেই আমি আমার নিজের উৎপন্ন দখল করছি না অন্যের উৎপন্ন দখল করছি, তা অবশ্যই অতি পৃথক দুটো জিনিস প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভ্রূণাকারে সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যার মধ্যে নিহিত সেই মজুরি শ্রম অতিশয় প্রাচীন; আপতিক, বিক্ষিপ্ত রূপে তা বহু শতাব্দী যাবৎ দাস শ্রমের পাশাপাশি থেকেছে। কিন্তু সে ভ্রূণ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে যথারীতি বিকশিত হতে পারল শুধু তখন, যখন প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পূর্বশর্তগুলি পাওয়া গেল। (এঙ্গেলসের টীকা।)

বদলে গেল। ব্যক্তিগত উৎপাদকের উৎপাদন-উপায় তথা উৎপন্ন দ্রব্য ক্রমেই হয়ে উঠল মূল্যহীন; পুঁজিপতির অধীনে মজুরি শ্রমিক হয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না। কিছু পূর্বে যা ছিল ব্যতিরেক ও সহায়ক, সেই মজুরি-শ্রম হয়ে দাঁড়াল নিয়ম ও সমস্ত উৎপাদনের ভিত্তি; আগে যা ছিল পরিপূরক তাই অবশিষ্ট রইল শ্রমিকদের একমাত্র কর্ম হিশেবে। যারা ছিল অস্থায়ী মজুরি-শ্রমিক তারা হয়ে দাঁড়াল স্থায়ী মজুরি-শ্রমিক। এই স্থায়ী মজুরি-শ্রমিকের সংখ্যা আরো প্রভূত পরিমাণ বেড়ে ওঠে সে সময় সংঘটিত সামন্ত ব্যবস্থার ভাঙনে, সামন্ত প্রভুদের লশকর বাহিনী ভেঙে দেওয়া, বাস্তুজমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ প্রভৃতিতে। একদিকে পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত উৎপাদনের উপায় এবং অন্যদিকে শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের আর কিছুই নেই সেই উৎপাদকেরা, এ দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল. **সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের মধ্যকার বিরোধ আত্মপ্রকাশ করল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার বৈর রূপে।**

আমরা দেখেছি, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি ঢুকে পড়ল পণ্য উৎপাদক, ব্যক্তিগত উৎপাদকদের এমন একটা সমাজের মধ্যে, যাদের সামাজিক বন্ধন ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়। কিন্তু পণ্য-উৎপাদনের ভিত্তিতে গড়া প্রত্যেকটি সমাজেরই এই একটা বৈশিষ্ট্য আছে: উৎপাদকেরা তাদের নিজ সামাজিক অন্তঃসম্পর্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। যা পাওয়া গেছে তেমনি ধারা উৎপাদনের উপায় দিয়ে এবং বাকি চাহিদা মেটাতে যা দরকার তার বিনিময়ার্থে প্রত্যেকেই উৎপাদন করে তার নিজের জন্য। কেউ জানে না, তার বিশেষ মালটা বাজারে আসবে কতখানি, কী পরিমাণেই বা তার চাহিদা হবে। কেউ জানে না, তার স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যটা সত্যকার চাহিদা মেটাবে কিনা, তার উৎপাদন-খরচ সে পুষিয়ে নিতে পারবে কিনা, এমনকি আদৌ তার পণ্যটা বিক্রি হবে কিনা। সমাজীকৃত উৎপাদনে রাজত্ব করে নৈরাজ্য।

কিন্তু অন্যান্য প্রতিটি ধরনের উৎপাদনের মতো পণ্য উৎপাদনেরও কতকগুলি বিশিষ্ট অন্তর্নিহিত অবিচ্ছেদ্য নিয়ম আছে; এবং নৈরাজ্য সত্ত্বেও, নৈরাজ্যের ভেতরে, নৈরাজ্যের মাধ্যমেই এ সব নিয়ম কাজ করে যায়। এ নিয়মগুলো আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক আত্মসম্পর্কের একমাত্র অবিচল রূপ অর্থাৎ বিনিময়ের ক্ষেত্রে এবং প্রতিযোগিতার বাধ্যতামূলক নিয়ম হিশেবে ব্যক্তিগত উৎপাদকদের প্রভাবিত করে। প্রথম দিকে এ নিয়ম উৎপাদকদেরই জানা থাকে না, তা আবিষ্কার করতে হয় ক্রমে ক্রমে, অভিজ্ঞতার ফলে। এ নিয়ম তাই

উৎপাদকদের অপেক্ষা না রেখে, তাদেরই বিরুদ্ধে, তাদের বিশেষ বিশেষ উৎপাদনের অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মরূপে কাজ করে যায়। উৎপন্ন শাসন করে উৎপাদকদের।

মধ্যযুগীয় সমাজে, বিশেষ করে আগেকার শতকগুলিতে উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো। প্রধানত তা মেটাত উৎপাদক ও তার পরিবারের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অধীনতা সম্পর্ক যেখানে ছিল, যেমন গ্রামাঞ্চলে, সেখানে তা সামন্ত প্রভুর প্রয়োজনও মেটাতে সাহায্য করত। সুতরাং, এটা বিনিময়ের ব্যাপার ছিল না, উৎপন্নও সেই কারণে পণ্যের রূপ নেয় নি। কৃষক পরিবারটির যা যা প্রয়োজন — কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র তথা তার জীবিকা নির্বাহের উপায়, প্রায় সব তারাই উৎপন্ন করত। নিজের প্রয়োজন মেটানো এবং সামন্ত প্রভুর নিকট ফসলী খাজনা পরিশোধের অতিরিক্ত যখন সে কিছু উৎপাদন শুরু করল, কেবল তখনই সে উৎপাদন করল পণ্য। সামাজিক বিনিময়ের মধ্যে যা এসেছে এবং বিক্রয়ের জন্য যা ছাড়া হয়েছে সেই উদ্বৃত্তটা হয়ে দাঁড়াল পণ্য।

শহরের হস্তশিল্পীদের প্রথম থেকেই পণ্য উৎপাদন করতে হত সত্য, কিন্তু তারাও তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনের বেশির ভাগটাই নিজেরা মেটাত। বাগান আর জমি ছিল তাদের। গবাদি পশুপাল তাদের চরত বারোয়ারী বনে, কাঠ আর জ্বালানিও তারা পেত সেখান থেকে। মেয়েরা শণ, পশম বুনত ইত্যাদি। বিনিময়ের জন্য উৎপাদন, পণ্য-উৎপাদন তখনো মাত্র তার শৈশবে সুতরাং, বিনিময় ছিল সংকুচিত, বাজার সংকীর্ণ, উৎপাদন-পদ্ধতি অনড়; বাইরের দিকে ছিল স্থানীয় বিচ্ছিন্নতা, ভিতর দিক থেকে ছিল স্থানীয় ঐক্য; গ্রামাঞ্চলে মার্ক*, শহরে গিল্ড।

কিন্তু পণ্য-উৎপাদনের প্রসার, বিশেষ করে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এযাবৎ যা ছিল সুপ্ত, পণ্য-উৎপাদনের সেই নিয়মগুলি অধিকতর প্রকাশ্যে প্রবলতররূপে সক্রিয় হয়ে উঠল পুরনো বন্ধন হয়ে গেল শিথিল, বিচ্ছিন্নতার সাবেকি সীমা ভেঙে পড়ল, উৎপাদকেরা ক্রমেই বেশি বেশি পরিবর্তিত হল আলাদা আলাদা স্বাধীন পণ্য-উৎপাদক রূপে। পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, সাধারণ সামাজিক উৎপাদন রয়েছে এক পরিকল্পনাহীনতা, আকস্মিকতা, নৈরাজ্যের শাসনে এবং এ নৈরাজ্য ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল।

* শেষের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য (এঙ্গেলসের টীকা)। এঙ্গেলস এখানে তাঁর নিজের রচনা 'মার্ক'-এর নজির দিচ্ছেন। ৪ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কিন্তু সমাজীকৃত উৎপাদনের এই নৈরাজ্যকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রধান যে উপায়ে তীব্র করে তোলে, সেটা নৈরাজ্যের ঠিক বিপরীত। সে উপায় হল প্রতিটি আলাদা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে একটা সামাজিক বনিয়াদের ওপর উৎপাদনের ক্রমবর্ধিত সংগঠন। এর ফলে সাবেকি শান্তিপূর্ণ সুস্থির অবস্থার অবসান হল. শিল্পের কোনো একটা শাখায় উৎপাদনের এই পদ্ধতির সংগঠন প্রবর্তিত হলেই তা আর অন্য কোনো উৎপাদন-পদ্ধতিকে সেখানে বরদাস্ত করে না। শ্রমক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল রণক্ষেত্র। বিপুল সব ভৌগোলিক আবিষ্কার (৫২) এবং তার পেছু পেছু উপনিবেশীকরণের ফলে বাজার বর্ধিত হল বহুগুণ, কারখানা ব্যবস্থা হিশেবে হস্তশিল্পের রূপান্তর ত্বরান্বিত হল। একটা বিশেষ অঞ্চলের বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যেই কেবল যুদ্ধ বাধল তা নয়। স্থানীয় সংগ্রাম থেকে আবার সৃষ্টি হল জাতীয় সংঘাত, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাণিজ্যিক যুদ্ধ (৫৩)।

পরিশেষে, আধুনিক শিল্প ও বিশ্ববাজারের উন্মুক্তির ফলে এ সংগ্রাম হয়ে উঠল বিশ্বজনীন, এবং সেই সঙ্গে অভূতপূর্ব রকমের বিষাক্ত উৎপাদনের স্বাভাবিক বা কৃত্রিম পরিস্থিতির সুবিধা দ্বারাই এখন এক একজন পুঁজিপতির তথা গোটা শিল্প ও দেশের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নির্ধারিত হতে থাকল যার হার হয় তাকে নির্মমভাবে ঠেলে ফেলা হয় এ সেই ডারউইনী অস্তিত্বের সংগ্রাম প্রচন্ড হয়ে স্থানান্তরিত হল প্রকৃতি থেকে সমাজে পশুর পক্ষে অস্তিত্বের যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক তাই যেন হয়ে দাঁড়ায় মানবিক বিকাশের শেষ কথা। সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের বিরোধ এবার প্রকাশ পায় এক একটা কারখানার উৎপাদন সংগঠনের সঙ্গে সাধারণভাবে সমাজের উৎপাদন-নৈরাজ্যের বৈর হিশেবে।

এই দুই রূপে যে বৈর উদ্ভব থেকেই তার মধ্যে নিহিত, তার ভেতরেই পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির গতি ফুরিয়ে কর্তৃক পূর্বেই আবিষ্কৃত এ 'পাপ চক্র' থেকে তা কখনো বেরতে পারে না। আর তাঁর যুগে ফুরিয়ে যেটা লক্ষ্য করতে পারেন নি সেটা হল এই যে, এ চক্র ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে উঠছে; গতি হয়ে উঠছে ক্রমেই এক সর্পিলবৃত্ত, এবং কেন্দ্রের সংঘর্ষে গ্রহাদির গতির মতো তার অবসান অনিবার্য। সাধারণ সামাজিক উৎপাদনের মধ্যস্থ নৈরাজ্যের বাধ্যকরণী শক্তিতেই বিপুল সংখ্যক মানুষ পুরোপুরি প্রলেতারিয়েতে পরিণত হচ্ছে; এবং ব্যাপক প্রলেতারীয় জনগণই আবার পরিণামে উৎপাদন-নৈরাজ্যের

অবসান ঘটাবে। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের বাধ্যকরণী শক্তিতেই আধুনিক শিল্পে যন্ত্রের সীমাহীন উন্নয়ন পরিণত হচ্ছে এক আবশ্যিক নিয়মে এর ফলে প্রত্যেকটি শিল্পজীবী পুঁজিপতিকেই তার যন্ত্রকে ক্রমাগত উন্নত করে তুলতে হবে নইলে ধ্বংস অনিবার্য।

কিন্তু যন্ত্রের উন্নয়ন অর্থ মানবিক শ্রমকে অনাবশ্যক করে তোলা। যন্ত্রের প্রবর্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ যদি হয়ে থাকে অল্পসংখ্যক যন্ত্র-কর্মী দিয়ে লক্ষ লক্ষ কায়িক শ্রমিকের স্থানচ্যুতি, তাহলে যন্ত্রের উন্নয়নের অর্থ এবার যন্ত্র-কর্মীদেরই ক্রমাগত অপসারণ। পরিণামে এর অর্থ পুঁজির গড়পড়তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদল মজুরি-শ্রমিকের সৃষ্টি যাদের হাতের কাছে পাওয়া যাবে, ১৮৪৫ সালে* যাকে বলেছিলাম, শিল্পের সেই একটা গোটাগুটি মজুদ বাহিনী গঠন, শিল্প যখন খুব চড়া, তখন তাদের পাওয়া যাবে, অনিবার্য ধ্বস এলেই আবার যাদের ছাঁটাই করা হবে, পুঁজির সঙ্গে অস্তিত্বের সংগ্রামে যারা শ্রমিক শ্রেণীর স্কন্ধে এক নিরন্তর ভারস্বরূপ, পুঁজির স্বার্থানুযায়ী একটা নিচু মানে মজুরি নামিয়ে রাখার মতো এক নিয়ন্ত্রক। এই ভাবেই, মার্কসের কথায়, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজির সংগ্রামে যন্ত্রই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে প্রবল অস্ত্র; শ্রমিকের হাত থেকে অনবরতই তার জীবিকার উপায় ছিনিয়ে নেয় শ্রমের যন্ত্র; শ্রমিকেরই যা সৃষ্টি তাই হয়ে দাঁড়ায় তাকে অধীনস্থ করার এক হাতিয়ার (৫৪)। এই ভাবেই শ্রম যন্ত্রের মিতব্যয় সেই সঙ্গে গোড়া থেকেই হয়ে দাঁড়ায় শ্রমশক্তির অতি বেপরোয়া অপচয়, শ্রম-কর্মের (৫৫) সাধারণ পরিস্থিতির ভিত্তিতেই লুণ্ঠন; যন্ত্র, 'শ্রম-সময় সংক্ষেপের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, হয়ে দাঁড়ায় পুঁজির মূল্যবৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রতিটি মুহূর্তকে পুঁজিপতির হাতে তুলে দেবার অতি মোক্ষম উপায়'। ('পুঁজি', ইংরাজি সংস্করণ, পৃঃ ৪০৬।) এই ভাবেই কিছু লোকের কর্মহীনতার প্রাথমিক সর্ত হয় অন্য কিছুর অতি মেহনত এবং সারা বিশ্ব জুড়ে নতুন নতুন খরিদ্দার-সন্ধানী আধুনিক শিল্প স্বদেশীয় জনগণের ভোগসীমাকে নামিয়ে আনে অনশন মাত্রার ন্যূনতমে, তাই করতে গিয়ে স্বদেশের নিজ বাজারকেই তা ধ্বংস করে। 'পুঁজি সঞ্চয়ের জের ও ব্যাপকতার সঙ্গে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনতা, বা শিল্পের মজুদ বাহিনীর ভারসাম্য সর্বদাই

* 'ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' (Sonnenschein & Co.), পৃঃ ৮৪। (এঙ্গেলসের টীকা।)

রক্ষিত হয় যে নিয়মে, তা পুঁজির সঙ্গে মজুরকে যতটা কঠিন করে প্রোথিত করে রাখে তা প্রমেথিউসকে* পাহাড়ে প্রোথিত করার ভালকানী কীলকের চেয়েও জোরালো। পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সঞ্চয় করে তোলে দৈন্য। এক প্রান্তে ধনসঞ্চয় তাই একই সঙ্গে হল অন্য প্রান্তে দৈন্য, শ্রম-জর্জরতা, দাসত্ব, অজ্ঞতা, পাশবিকতা, মানসিক অধঃপতনের সঞ্চয় অর্থাৎ সেই শ্রেণীর ক্ষেত্রে যারা তাদেরই স্বীয় উৎপন্নকে উৎপাদন করছে পুঁজির আকারে।' (মার্কসের 'পুঁজি' [Sonnenschein & Co], পৃঃ ৬৬১।) উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো উৎপন্ন-বণ্টন আশা করা আর এ আশা করা সমান কথা যে, ব্যাটারির ইলেকট্রোড যতক্ষণ ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত ততক্ষণ এ্যাসিড মেশা জলকে তা বিশ্লিষ্ট করবে না, তার ধনাত্মক মেরু থেকে অক্সিজেন ও ঋণাত্মক মেরু থেকে হাইড্রোজেন ছাড়তে থাকবে না।

আমরা দেখেছি, আধুনিক শিল্প যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীলতা সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্যের দ্বারা পরিণত হয়েছে এমন একটা বাধ্যতামূলক নিয়মে যাতে প্রত্যেক শিল্পজীবী পুঁজিপতি সর্বদাই তার যন্ত্রকে উন্নত করতে, সর্বদাই সে যন্ত্রের উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়িয়ে যেতে বাধ্য হন। উৎপাদন ক্ষেত্র প্রসারের সম্ভাবনাটাও তার কাছে অনুরূপ একটা বাধ্যতামূলক নিয়মে দাঁড়ায়। আধুনিক শিল্পের বিপুল সম্প্রসারণ-শক্তির কাছে গ্যাসের সম্প্রসারণ-শক্তিকে মনে হয় ছেলেখেলা, এ শক্তি এখন আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় গুণগত ও পরিমাণগত সম্প্রসারণের এমন এক আবশ্যিকতা রূপে যা কোনো বাধারই পরোয়া করে না। এ বাধা আসে পরিভোগ থেকে, বিক্রয় থেকে, আধুনিক শিল্প মালের বাজার থেকে। কিন্তু বাজারের সম্প্রসারণ-ক্ষমতা ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় শাসিত হয় প্রধানত অন্য কতকগুলি নিয়মে, যার তেজ অনেক কম। উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে বাজারের সম্প্রসারণ তাল রাখতে পারে না। সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, এবং উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে চূর্ণবিচূর্ণ না করা পর্যন্ত যেহেতু এই সংঘাত থেকে কোনো সত্যকার সমাধান সম্ভব নয়, তাই সংঘাতগুলো আসতে থাকে পর্যায়ক্রমে। পুঁজিবাদী উৎপাদন জন্ম দিল আর একটি 'পাপ চক্রের'।

বস্তুতপক্ষে, ১৮২৫ সালে যখন প্রথম সাধারণ সংকট দেখা দেয়, তখন

* প্রমেথিউস — গ্রীক পুরাকথার এক বীর। দেবগণের কাছ থেকে অগ্নি হরণ করে এনে তিনি মানুষদের দেন। শাস্তি হিসেবে যিউস তাঁকে শৈলে শৃঙ্খলিত করে রাখেন এবং ঈগল তাঁর যকৃত ভক্ষণ করে। সম্পাঃ

থেকে সমগ্র শিল্প ও বাণিজ্য জগৎ, সমস্ত সভ্য জাতি ও তাদের মুখাপেক্ষী ন্যূনাধিক বর্বর জাতিদের উৎপাদন ও বিনিময় প্রতি দশ বছরে একবার করে বিকল হয়ে পড়ে। বাণিজ্য অচল হয়ে যায়, বাজার জাম হয়ে ওঠে, মাল জমতে থাকে, যতই তা অবিক্রেয় ততই তা স্তূপাকার, নগদ টাকা অদৃশ্য হয়, ঋণ দান থেমে যায়, বন্ধ হয়ে যায় ফ্যাক্টরি আর শ্রমিক জনগণের জীবন ধারণের উপায় যায়, কেননা জীবন ধারণের উপায় তারা উৎপন্ন করেছে অতিমাত্রায়; একের পর এক দেউলিয়া, একের পর এক ক্রোক। অচলাবস্থা চলে কয়েক বছর ধরে; উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্ন মালের অপচয় ও পাইকারীভাবে তার ধ্বংস চলতে থাকে যতদিন না সঞ্চিত পণ্যস্তূপের মোটের ওপর মূল্যহ্রাস হয়ে শেষ পর্যন্ত তা ঝরে যায়, যতদিন না উৎপাদন ও বিনিময় ধীরে ধীরে আবার চলতে শুরু করে। একটু একটু করে তার গতি বাড়ে। শুরু হয় দুলকি চলন। শিল্পের দুলকি চলন বেড়ে ওঠে ধাবনে এবং ধাবনও পরিণত হয় শিল্প, কারবারী ঋণ ও ফাটকার এক খাঁটি উদ্দাম কদমে ছোটায়, শেষ পর্যন্ত পাঁজরভাঙা লম্ফঝম্পের পর সেখানে এসেই থামে যেখানে শুরু অর্থাৎ সংকটের গহ্বরে। এই চলে ফিরে ফিরে। ১৮২৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচবার এই ঘটেছে এবং বর্তমানে (১৮৭৭) ছয়বারের বার তা ঘটছে। এ সব সংকটের চরিত্র এতই পরিষ্কার যে ফুরিয়ে crise pléthorique বা অত্যতিশয্যের সংকট বলে প্রথম সংকটটির যা বর্ণনা দিয়েছেন তাতেই সব সংকটের বর্ণনা হয়েছে।

এ সব সংকটে সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের বিরোধ এক প্রবল বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। পণ্য-সঞ্চালন কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়। সঞ্চালনের যা মাধ্যম, সেই মুদ্রা হয়ে দাঁড়ায় সঞ্চালনের প্রতিবন্ধক। পণ্য-উৎপাদন ও পণ্য সঞ্চালনের সমস্ত নিয়মই উল্টে যায়। অর্থনৈতিক সংঘাত পৌঁছয় তার শীর্ষ বিন্দুতে। উৎপাদনের পদ্ধতি বিদ্রোহ করে বিনিময় ধরনের বিরুদ্ধে।

ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে উৎপাদনের সমাজীকৃত সংগঠন এত দূর বিকশিত হয়েছে যে, সমাজে উৎপাদনের যে নৈরাজ্য থাকে এরই পাশাপাশি ও তার ওপর প্রভুত্ব করে, তার সঙ্গে তা আর খাপ খাচ্ছে না। এই ঘটনাটা খোদ পুঁজিপতিদের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংকট কালে পুঁজির হিংস্র পুঞ্জীভবনে, উৎপাদনের মাধ্যমে, বহু বৃহৎ এবং বহুতর ক্ষুদ্র পুঁজিপতির ধ্বংসে। উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতির সমগ্র ঠাট ভেঙে পড়ে তারই নিজস্ব সৃষ্টি উৎপাদন-শক্তির চাপে। এই পুঞ্জ পুঞ্জ উৎপাদন-উপায়কে

তা আর পুঁজিতে পরিণত করতে সক্ষম হয় না। সেগুলো পড়ে থাকে বেকার হয়ে এবং সেই হেতু শিল্পের মজুদ বাহিনীও থাকে বেকার। উৎপাদনের উপায়, জীবিকা নির্বাহের উপায়, হাতের আওতায় শ্রমিক, উৎপাদনের ও সাধারণ সম্পদের সমস্ত উপকরণই রয়েছে প্রচুর। কিন্তু প্রাচুর্য হয়ে দাঁড়ায় অভাব-অনটনের উৎস (ফুরিয়ে), কারণ উৎপাদন ও জীবন ধারণের উপায়ের পুঁজিতে রূপান্তরের প্রতিবন্ধক হয় এই প্রাচুর্যই, কেননা, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায় কাজ চালাতে পারে কেবল তখনই যখন তার প্রাথমিক রূপান্তর ঘটেছে পুঁজিতে, মানুষের শ্রমশক্তি শোষণের উপায়ে। উৎপাদন ও জীবন নির্বাহের উপায়কে পুঁজিতে রূপান্তরিত করার এই আবশ্যিকতা প্রেতের মতো শ্রমিক ও এই সব উপায়ের মধ্যে দণ্ডায়মান। কেবল এইটাই উৎপাদনের বৈষয়িক ও ব্যক্তিগত কারিকার সম্মিলনে বাধা দেয়, কেবল মাত্র তার জন্যই উৎপাদন উপায়ের সচল থাকা, শ্রমিকের খেটে বেঁচে থাকা বারণ। তাই একদিকে, এই উৎপাদন-শক্তিকে আর বেশি পরিচালনা করার অক্ষমতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি নিজেই অভিযুক্ত; অন্যদিকে, এই সব উৎপাদন-শক্তি ক্রমবর্ধমান তেজে এগিয়ে আসছে বর্তমান বিরোধের অবসানের দিকে, পুঁজি হিশেবে তাদের যে ধর্ম তা বিলোপের দিকে, সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিশেবে তাদের যে চরিত্র তার ব্যবহারিক স্বীকৃতির দিকে।

পুঁজি হিশেবে তাদের যে ধর্ম তার বিরুদ্ধে ক্রমপ্রবল উৎপাদন-শক্তির এই বিদ্রোহ, তাদের সামাজিক চরিত্র স্বীকৃত হোক, এই ক্রমবর্ধমান দাবির ফলে খাস পুঁজিপতি শ্রেণীও বাধ্য হয় তাদের ক্রমেই বেশি করে সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিশেবে ধরতে, পুঁজিবাদী পরিস্থিতির মধ্যে তা যতটা সম্ভব সেই পরিমাণে। বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের ভাঙন মারফত ধ্বংসের সময় যেটা, ঋণ ব্যবস্থায় অসীম স্ফীতি সমেত শিল্পের অতি চাপের পর্বটাতেও এইটাই বিপুল উৎপাদন উপায়সমূহের সেই ধরনের একটা সমাজীকরণ ঘটাবার প্রবণতা থাকে, যা আমরা বিভিন্ন জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে প্রত্যক্ষ করছি। উৎপাদন ও বণ্টনের এই উপায়সমূহের অনেকগুলিই গোড়া থেকেই এতই বিরাট যে, রেলওয়ের মতোই তাতে অন্যবিধ পুঁজিবাদী শোষণের অবকাশ মেলে না। আরো বিকাশের এক পর্যায়ে এই ধরনটাও অপ্রতুল হয়ে দাঁড়ায়। একটা বিশেষ দেশের একটা বিশেষ শিল্প-শাখার সমস্ত বড়ো বড়ো উৎপাদকেরা সংঘবদ্ধ হয় 'ট্রাস্টে', উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা সমিতিতে। উৎপাদের মোট পরিমাণ তারা স্থির করে, নিজেদের মধ্যে তা ভাগাভাগি করে নেয় এবং

এই ভাবে আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা বিক্রয়মূল্য চাপিয়ে দেয়। কিন্তু কারবারে মন্দা পড়তেই এই ধরনের ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণত ভেঙে পড়া সম্ভব এবং ঠিক এই কারণেই সমিতিগুলির আরো বেশি পরিমাণ কেন্দ্রীভবনের প্রয়োজন তা জাগায়। এক একটা শিল্পের সবখানিই পরিণত হয় এক অতিকায় জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে; আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার স্থান নেয় এই একটি কোম্পানির আভ্যন্তরীণ একচেটিয়া কারবার। তা ঘটেছে ১৮৯০ সালে ইংলণ্ডের অ্যালকালি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ৪৮টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান একীকরণের পর তা এখন একটি কোম্পানির হাতে, ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে একটি একক পরিকল্পনার ভিত্তিতে।

ট্রাস্টগুলিতে প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা পরিণত হয় ঠিক তার বিপরীতে — একচেটিয়া কারবারে, এবং পুঁজিবাদী-সমাজসুলভ বিনা-পরিকল্পনার উৎপাদন আত্মস্বীকার করে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক সমাজসুলভ নির্দিষ্ট পরিকল্পনার উৎপাদনের কাছে। অবশ্যই তাতে এখনো পর্যন্ত পুঁজিপতিদেরই সুবিধা ও উপকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শোষণটা এত জাজ্বল্যমান যে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য। ট্রাস্টগুলির উৎপাদন পরিচালনা, ক্ষুদ্র একদল ডিভিডেণ্ট-লিপ্সু দ্বারা সমাজের এমন নির্লজ্জ শোষণ কোনো জাতিই সহ্য করবে না।

যাই হোক না কেন, ট্রাস্ট থাকুক বা না থাকুক, পুঁজিবাদী সমাজের সরকারী প্রতিনিধি রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিচালনভার গ্রহণ করতে হবে*

---

* বলছি 'করতে হবে' কেননা, উৎপাদন ও বণ্টনের উপায় যখন সত্য সত্যই জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলি কর্তৃক পরিচালনের গণ্ডী থেকে ছাড়িয়ে যাবে, এবং সেই হেতু তাদের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ যখন অর্থনৈতিকভাবে অনিবার্য হবে, কেবল তখনই যদি সে কাজ আজকের এই রাষ্ট্রই করে তাহলেও, — ঘটবে একটা অর্থনৈতিক প্রগতি, সমস্ত উৎপাদন-শক্তির সমাজীকরণের দিকে প্রাথমিক আরো একটা পদক্ষেপ। কিন্তু ইদানীং, বিসমার্ক যখন থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা চালু করতে লেগেছেন তখন থেকে এক ধরনের মেকি সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, যা থেকে থেকেই এক ধরনের দাসসুলভ তোষামুদিতে অধঃপতিত হচ্ছে, যা ঘোষণা করে, এমনকি বিসমার্কী ধরন সমেত যে কোনো রাষ্ট্রীয় মালিকানাই সমাজতান্ত্রিক। তামাক শিল্প রাষ্ট্র দখল করলে যদি তা সমাজতান্ত্রিক হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নেপোলিয়ন ও মেটেরনিককে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য করতে হবে। বেলজিয়ম রাষ্ট্র যদি নিতান্ত মামুলি রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে তার প্রধান রেলপথ নিজেই নির্মাণ করে; কোনো অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ফলে নয়, নিছকই যুদ্ধের সময় অনায়াসে হাতে রাখা যাবে বলে, সরকারের পক্ষে ভোটদাতা গড্ডলিকাস্বরূপ রেলকর্মচারীদের গড়ে তোলার জন্য, এবং বিশেষ করে

নিজের হাতে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিবর্তনের এই প্রয়োজন সর্বাগ্রে দেখা দেয় যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিতে   ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলে।

আধুনিক উৎপাদন শক্তির পরিচালনায় বুর্জোয়ারা আর সক্ষম নয়, এই যদি প্রকাশ পায় সংকট থেকে, তবে উৎপাদন ও বণ্টনের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলির জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি, ট্রাস্ট, ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয় সে কাজের জন্য বুর্জোয়ারা কী পরিমাণ অনাবশ্যক। পুঁজিপতির সামাজিক ক্রিয়ার সবকটিই এখন নির্বাহিত হয় বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা। ডিভিডেণ্ট পকেটস্থ করা, কুপন কাটা আর বিভিন্ন পুঁজিপতিরা যেখানে পরস্পরের পুঁজি হরণ করে সেই স্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকা খেলা ছাড়া পুঁজিপতির আর কোনো সামাজিক কর্ম নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রথমে বিতাড়িত করে মজুরদের; এখন তা বিতাড়িত করছে পুঁজিপতিদের, মজুরদের মতোই তাদেরও ঠেলে দিচ্ছে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্তরে, যদিও শিল্পের মজুদ বাহিনীতে অবিলম্বেই নয়।

কিন্তু জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি ও ট্রাস্টে, অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তর, এর কোনোটাতেই উৎপাদন-শক্তির পুঁজিবাদী চরিত্রের অবসান হয় না। জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি ও ট্রাস্টে তা স্বতঃই স্পষ্ট। আর আধুনিক রাষ্ট্রও আবার শ্রমিক তথা ব্যক্তিবিশেষ পুঁজিপতির হামলার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বাহ্য পরিস্থিতিকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত একটা সংগঠন মাত্র। রূপ যাই হোক না কেন, আধুনিক রাষ্ট্র হল মূলত একটি পুঁজিবাদী যন্ত্র, পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র, সামগ্রিক জাতীয় পুঁজির আদর্শ মূর্তায়ন উৎপাদন-শক্তিকে যতই সে হাতে নিতে যায়, ততই সে সত্য করেই হয়ে ওঠে জাতীয় পুঁজিপতি, তত বেশি অধিবাসীকে তা শোষণ করতে

পার্লামেণ্টারী ভোটের তোয়াক্কা না রেখে নিজের জন্য একটা নতুন আয়ের উৎস তৈরির উদ্দেশ্যে যদি বিসমার্ক প্রধান প্রধান প্রুশীয় রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ত করেন, তাহলে কোনো অর্থেই, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় না। নইলে, রাজকীয় Sechandlung (৫৬), রাজকীয় চীনামাটি কারখানা, এমনকি সেনাবাহিনীর দর্জি-প্রতিষ্ঠানকেও বলতে হয় সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, এমনকি তৃতীয় ফ্রিডরিখ ভিলহেলমের রাজত্বকালে এক ধূর্ত শৃগাল যা গুরুত্বসহকারে প্রস্তাব করেছিল, রাষ্ট্র কর্তৃক বেশ্যালয়গুলি গ্রহণের সে ব্যাপারটা পর্যন্ত হয় সমাজতান্ত্রিক। (এঙ্গেলসের টীকা)

থাকে। শ্রমিকেরা থেকেই যায় মজুরি-শ্রমিক, প্রলেতারীয়, পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান হয় না বরং তাকে চূড়ান্ত শীর্ষে তোলা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত শীর্ষে ওঠাতেই তা উল্টে পড়ে। উৎপাদন-শক্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা সংঘাতের সমাধান নয়, কিন্তু সে সমাধানের যা উপকরণ সেই টেকনিক্যাল সর্ত তার মধ্যেই লুক্কায়িত।

এ সমাধান সম্ভব কেবল আধুনিক উৎপাদন-শক্তির সামাজিক চরিত্রের বাস্তব স্বীকৃতিতে, এবং সেই হেতু, উৎপাদন-উপায়ের সমাজীকৃত চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন, দখল ও বিনিময় পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধানে। সামগ্রিকভাবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণকে যা ছাপিয়ে উঠেছে সেই উৎপাদন-শক্তিকে প্রকাশ্যে ও সরাসরি সমাজের হাতে নিয়েই কেবল তা সম্ভব উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রটা আজ উৎপাদকের বিরুদ্ধে সক্রিয়, সমস্ত উৎপাদন ও বিনিময়কে তা থেকে থেকেই বানচাল করে দেয়, অন্ধ বলাশ্রয়ী বিধ্বংসী এক প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই শুধু তার ক্রিয়া। কিন্তু সমাজ কর্তৃক উৎপাদন শক্তিগুলিকে গ্রহণের পর উৎপাদন উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রের ব্যবহার উৎপাদকেরা করবে তার প্রকৃতিটা পুরোপুরি বুঝে, বিঘ্ন ও পর্যায়িক ধ্বংসের উৎস না হয়ে তা হবে উৎপাদনের প্রবলতম এক উত্তোলক।

সক্রিয় সামাজিক শক্তিগুলি কাজ করে ঠিক প্রাকৃতিক শক্তির মতোই: যতক্ষণ তাদের না বুঝছি, হিসাবে না মেলাচ্ছি ততক্ষণ তা অন্ধ, বলাশ্রয়ী, বিধ্বংসী. কিন্তু একবার তাদের যদি বোঝা যায়, একবার যদি তাদের ক্রিয়া, গতিমুখ ও ফলাফল ধরা যায়, তাহলে তাদের ক্রমাগত আমাদের আজ্ঞাবহ করে তোলা, তাদের সাহায্যে আমাদের লক্ষ্যসাধন করাটা নির্ভর করছে আমাদেরই ওপর। আজকের পরাক্রান্ত উৎপাদন শক্তিগুলির ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষ করেই খাটে। এই সব সক্রিয় সামাজিক উপায়গুলির প্রকৃতি ও চরিত্র বুঝতে আমরা যতক্ষণ গোঁয়ারের মতো অনিচ্ছুক - এ বোধ পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও তার সমর্থকদের প্রবণতার বিরুদ্ধেই যায় — ততক্ষণ এ শক্তিগুলি কাজ করে যাবে আমাদের অপেক্ষা না রেখেই, আমাদের বিরুদ্ধে, ততক্ষণ তারা আধিপত্য করে যাবে আমাদের ওপর, পূর্বে যা আমরা বিশদে দেখিয়েছি।

কিন্তু একবার যদি তাদের প্রকৃতি বোঝা যায়, তাহলে একত্রে-খাটা উৎপাদকদের হাতে তাদের পরিণত করা যায় দানবপ্রভু থেকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে। তফাৎটা হল বজ্রস্থ বিদ্যুতের ধ্বংসশক্তির সঙ্গে টেলিগ্রাফ ও ভল্টেইক আর্কের

বশীভূত বিদ্যুতের তফাৎ, দাবাগ্নির সঙ্গে মানুষের কাজে লাগানো আগুনের তফাৎ। শেষপর্যন্ত আজকের উৎপাদনী শক্তিগুলির আসল চরিত্রের এই স্বীকৃতির ফলে উৎপাদনের সামাজিক নৈরাজ্যের স্থান নেয় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে, সমাজ ও প্রতিটি ব্যক্তির প্রয়োজনানুযায়ী উৎপাদনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। উৎপন্ন দ্রব্য যেখানে প্রথমে উৎপাদককে ও পরে দখলকারীকে দাসত্ববন্ধনে বাঁধে, দখলের সেই পুঁজিবাদী পদ্ধতির জায়গায় তখন আসে দখলের এমন এক পদ্ধতি, আধুনিক উৎপাদন উপায়ের চরিত্র যার ভিত্তি· একদিকে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া ও বাড়িয়ে তোলার উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ সামাজিক দখল, এবং অন্যদিকে জীবিকা নির্বাহ ও উপভোগের উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত দখল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি জনসংখ্যার বিপুল অধিকাংশকে ক্রমেই পরিপূর্ণ প্রলেতারিয়েতে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তির সৃষ্টি করে যা ধ্বংস পেতে না হলে এ বিপ্লব সাধন করতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যেই যা সমাজীকৃত হয়ে উঠেছে, সেই বিপুল উৎপাদন-উপায়কে ক্রমাগত বেশি করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে বাধ্য করার সঙ্গে সঙ্গে তা নিজেই এ বিপ্লব সাধনের পথ দেখায়। **প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ক'রে উৎপাদন-উপায়কে পরিণত করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে।**

কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রলেতারিয়েত হিশেবে তার আত্মাবসান ঘটে, লুপ্ত হয় সমস্ত শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী-বৈর, রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হিশেবে যে অস্তিত্ব তাও বিলুপ্ত হয়। শ্রেণী-বৈরের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের এযাবৎ প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রের, অর্থাৎ pro tempore যা শোষক শ্রেণী তেমন একটা বিশেষ শ্রেণীর এক সংগঠনের, প্রচলিত উৎপাদন পরিস্থিতিতে যাতে বাইরে থেকে কোনো ব্যাঘাত না আসে, সেটা নিবারণই তার উদ্দেশ্য, এবং সুতরাং, বিশেষ করে নির্দিষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতির (ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব, মজুরি-শ্রম) সহগামী পীড়ন ব্যবস্থার মধ্যে শোষিত শ্রেণীগুলিকে সবলে দাবিয়ে রাখাই তব উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র ছিল সামগ্রিকভাবে সমাজের সরকারী প্রতিনিধি, একটা দৃষ্টিগোচর প্রতিভূ হিশেবে তার কেন্দ্রীভাব। কিন্তু তা শুধু যে পরিমাণে, তা তেমন একটা শ্রেণীর রাষ্ট্র যা তৎকালে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে: প্রাচীন কালে ক্রীতদাসমালিক নাগরিকদের রাষ্ট্র; মধ্য যুগে সামন্ত প্রভুদের; আমাদের কালে বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র যখন অবশেষে সমগ্র সমাজের সত্যকার প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা নিজেকে করে তোলে অনাবশ্যক। অধীনে রাখার মতো কোনো সামাজিক শ্রেণী

যেই আর থাকে না, যেই শ্রেণী-শাসন এবং আমাদের বর্তমান উৎপাদন-নৈরাজ্যের ভিত্তিতে অস্তিত্বের জন্য ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও তদুদ্ভূত সংঘর্ষ ও অনাচারের অবসান হয়, অমনি দমন করার মতো কিছুও আর বাকি থাকে না, এবং একটা বিশেষ দমন-শক্তির, একটা রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন হয় না। প্রথম যে কাজটার ফলে রাষ্ট্র সত্য করেই নিজেকে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি করে তোলে — সমাজের নামে উৎপাদন-উপায়গুলিকে দখল করা — সেইটাই হল একই কালে রাষ্ট্র হিশেবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। সামাজিক সম্পর্কে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হয়ে উঠতে থাকে এবং তারপর নিজে থেকেই তা শুকিয়ে মরে। লোক শাসন করার স্থানে আসে বস্তুর ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালনা। রাষ্ট্রকে 'উচ্ছেদ' করা হয় না, তা মরে যায়। 'মুক্ত জনরাষ্ট্র' (৫৭) কথাটিকে আন্দোলকেরা যে মধ্যে মধ্যে ন্যায্যতই ব্যবহার করে থাকেন, সেদিক থেকে এবং তার অন্তিম বৈজ্ঞানিক অপূর্ণতা, উভয় দিক থেকেই কথাটার মূল্যায়ন পাওয়া যাচ্ছে এ থেকে, অবিলম্বে রাষ্ট্র উচ্ছেদের জন্য তথাকথিত নৈরাজ্যবাদীদের দাবিটারও।

পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির ঐতিহাসিক আবির্ভাবকাল থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তি তথা বিভিন্ন সম্প্রদায় সমস্ত উৎপাদন-উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের স্বপ্ন দেখে এসেছেন ন্যূনাধিক অস্পষ্টভাবে, ভবিষ্যতের আদর্শ হিশেবে। কিন্তু তা সম্ভব হতে পারে, ঐতিহাসিক রূপে আবশ্যিক হয়ে উঠতে পারে শুধু তখনই যখন তার বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ অবস্থা বর্তমান। অপরাপর প্রতিটি সামাজিক প্রগতির মতোই তা সম্ভবপর হয় এই জন্য নয় যে, লোকে বুঝতে পারছে, শ্রেণীর অস্তিত্ব ন্যায়, সমানাধিকার ইত্যাদির পরিপন্থী, এ শ্রেণী-বিলোপের ইচ্ছা দ্বারাই কেবল নয়, সম্ভবপর হয় কতকগুলি নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে। শোষক ও শোষিত শ্রেণী, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণীতে সমাজের বিভাগ ছিল পূর্বতন কালের উৎপাদনের অপরিণত সীমাবদ্ধ বিকাশের অপরিহার্য পরিণাম। সকলের অস্তিত্বের জন্য কোনো ক্রমে যেটুকু দরকার তার চেয়ে কেবল অতি অল্পপরিমাণ উদ্বৃত্ত যতদিন উৎপন্ন হচ্ছে সমগ্র সামাজিক মেহনত দ্বারা, সেই হেতু সমাজ-সদস্যদের বিপুল অধিকাংশের সমস্ত বা প্রায় সমস্ত সময় যতদিন খেয়ে যাচ্ছে মেহনতের পিছনে, — ততদিন অনিবার্যভাবেই এ সমাজ বিভক্ত থাকছে শ্রেণীতে। পুরোপুরি মেহনতের দ্বারা বাঁধা গোলাম, সেই বিপুল অধিকাংশের পাশাপাশি উদিত হয় প্রত্যক্ষ উৎপাদনী শ্রম থেকে মুক্ত একটা শ্রেণী, যারা সমাজের সাধারণ বিষয়গুলির দেখাশোনা করে, যেমন

শ্রম পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় কর্ম আইন, বিজ্ঞান শিল্প ইত্যাদি। সুতরাং, শ্রম-বিভাগের নিয়মটাই আছে শ্রেণী-বিভাগের মূলে। কিন্তু তাতে করে বলাৎকার ও লুণ্ঠন, বুজরুকি ও জুয়াচুরি দ্বারা এই শ্রেণী-বিভাগ সম্পাদন আটকায় না। শাসক শ্রেণী একবার আধিপত্য পাবার পর শ্রমিক শ্রেণীর বিনিময়ে তার ক্ষমতা সংহত করা, নিজেদের সামাজিক নেতৃত্বটাকে জনগণের তীব্রতর শোষণে পরিণত করা তার আটকায় না।

কিন্তু এই যুক্তিতে শ্রেণী-বিভাগের যদি একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ন্যায্যতা থেকে থাকে, তবে তা শুধু একটা বিশেষ পর্বের জন্য, কেবল একটা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির আমলে তার ভিত্তি ছিল উৎপাদনের অপ্রতুলতা। আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পূর্ণ বিকাশের ফলে তা ভেসে যাবে। এবং বস্তুত, সমাজের শ্রেণী বিলোপে ঐতিহাসিক বিকাশের এমন একটা মাত্রা ধরে নেওয়া হয়, যেখানে অমুক অমুক বিশেষ শাসক শ্রেণী কেবল নয়, যে কোনো রকম শাসক শ্রেণীরই এবং সেই হেতু, শ্রেণীভেদের অস্তিত্বই হয়ে উঠেছে এক অপ্রচলিত কাল-ব্যতিক্রম, সুতরাং তা ধরে নেয় উৎপাদনের এমন একটা পর্যায়ে বিকাশ, যেখানে সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দখল এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভুত্ব, সংস্কৃতির একাধিপত্য ও বুদ্ধিমার্গীয় নেতৃত্ব শুধু যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তাই নয়, অর্থনীতি, রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিকাশের প্রতিবন্ধক।

এ সীমায় এখন আমরা পৌঁছেছি, বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিমার্গীয় দেউলিয়াপনা স্বয়ং বুর্জোয়াদের কাছেও আর গোপন নয়। তাদের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার আবির্ভাব ঘটছে নিয়মিতভাবে প্রতি দশ বছর অন্তর প্রতিটি সংকটেই সমাজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠছে তারই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্নের চাপে তাকে সে আর ব্যবহার করতে পারছে না, অসহায়ের মতো সে এই অদ্ভুত স্ববিরোধের সম্মুখীন যে, উৎপাদকদের ভোগ্য কিছুই নেই কেননা পরিভোগী কেউ নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যে নিগড় চাপিয়েছিল তা ফেটে বেরচ্ছে উৎপাদন উপায়ের সম্প্রসারণী শক্তি। উৎপাদন-শক্তির অবিরাম, নিয়ত ত্বরান্বিত বিকাশ এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনেরই কার্যত সীমাহীন বৃদ্ধির একমাত্র পূর্বসর্ত হল এই সব নিগড় থেকে উৎপাদন উপায়ের মুক্তি। শুধু তাই নয়। উৎপাদন-উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের ফলে শুধু যে উৎপাদনের বর্তমান কৃত্রিম বাধাগুলি দূর হয়ে যায় তাই নয়, দূর হয় উৎপাদন-শক্তি ও

উৎপন্নের সেই প্রত্যক্ষ অপচয় ও সর্বনাশ, যা বর্তমানে উৎপাদনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ এবং সংকটকালে যা সর্বোচ্চে ওঠে। অধিকন্তু, আজকের শাসক শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অমিতাচারের অবসান ক'রে তা উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের একটা বড়ো অংশকে উন্মুক্ত করে দেয় সাধারণ সমাজের জন্য। সমাজীকৃত উৎপাদন দ্বারা সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য বৈষয়িকভাবে পর্যাপ্ত এবং দিন দিন পরিপূর্ণতর একটা অস্তিত্বই শুধু নয়, সকলের কায়িক ও মানসিক বৃত্তির অবাধ বিকাশ ও প্রয়োগের নিশ্চিতি-দেওয়া একটা অস্তিত্ব অর্জনের যে সম্ভাবনা, তা এই প্রথম এলেও এসে গেছে।*

সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের উপায় দখলের পর অবসান হয় পণ্য-উৎপাদনের এবং যুগপৎ উৎপাদকের ওপর উৎপন্নের আধিপত্যের, সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের বদলে আসে প্রণালীবদ্ধ সুনির্দিষ্ট সংগঠন। ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম অন্তর্হিত হয়। একটা বিশেষ অর্থে তখনই সেই প্রথম মানুষ অবশিষ্ট প্রাণীজগৎ থেকে চূড়ান্তভাবে তফাৎ হয়ে অস্তিত্বের নিতান্ত পাশবিক পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হয় সত্যকার মানবিক পরিস্থিতিতে। জীবন ধারণের যে ক্ষেত্রটা মানুষকে ঘিরে আছে এবং এযাবৎ তার ওপর আধিপত্য করেছে, সেই সমগ্র ক্ষেত্রটা এখন আসে মানুষের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণে এই প্রথম মানুষ হয়ে ওঠে প্রকৃতির সত্যকার সচেতন প্রভু, কেননা নিজেদের সমাজ সংগঠনের প্রভু সে হতে পেরেছে। তারই নিজ সামাজিক ক্রিয়ার যে নিয়ম এতদিন পরকীয় প্রাকৃতিক নিয়মের মতো তার ওপর আধিপত্য করেছে, তা এখন ব্যবহৃত হবে পরিপূর্ণ বোধের সঙ্গে, এবং

---

* পুঁজিবাদী চাপের তলেও আধুনিক উৎপাদন-উপায়ের বিপুল সম্প্রসারণী শক্তির একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে গোটাকতক সংখ্যা থেকে। মিঃ গিফেনের মতে, গ্রেট বৃটেন ও আয়র্ল্যান্ডের মোট সম্পদের পরিমাণ পূর্ণসংখ্যায়:

১৮১৪ সাল — ২২০,০০,০০,০০০ পাউন্ড,
১৮৬৫ সাল — ৬১০,০০,০০,০০০ পাউন্ড,
১৮৭৫ সাল — ৮৫০,০০,০০,০০০ পাউন্ড।

সংকটকালে উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের অপচয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৭৩ — ১৮৭৮ সালের সংকটে কেবল জার্মান লৌহ শিল্পেরই মোট ক্ষতির পরিমাণ ২,২৭,৫০,০০০ পাউন্ড বলে দ্বিতীয় জার্মান শিল্প-কংগ্রেসে (বার্লিন, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮) উল্লিখিত হয়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

সেই হেতু তার ওপর প্রভুত্ব করবে মানুষ মানুষেরই নিজ যে সামাজিক সংগঠন এতদিন প্রকৃতি ও ইতিহাস থেকে চাপানো এক আবশ্যিকতা রূপে তার সম্মুখীন হয়েছে, সে সংগঠন এখন হয়ে দাঁড়ায় তারই স্বাধীন কর্মের ফল। যে বহির্ভূত অবজেক্টিভ শক্তিগুলি এতদিন ইতিহাসকে শাসন করেছে, তা চলে আসে মানুষেরই নিয়ন্ত্রণের অধীনে। শুধু সেই সময় থেকেই ক্রমাগত সচেতনভাবে মানুষই রচনা করবে তার স্বীয় ইতিহাস, কেবল সেই সময় থেকেই মানুষ যে সামাজিক কারণগুলিকে গতিদান করবে সেগুলি প্রধানত এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে তারই বাঞ্ছিত ফলপ্রসব করবে। এ হল আবশ্যিকতার রাজ্য থেকে মুক্তির রাজ্যে মানুষের উত্তরণ।

আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংক্ষেপ রূপরেখার সারসংকলন করা যাক।

১। **মধ্যযুগীয় সমাজ** — ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিগত উৎপাদন। উৎপাদনের উপায় ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী; সেই হেতু আদিম, কদাকার, নগণ্য, ক্রিয়া তাদের খর্বিত। হয় স্বয়ং উৎপাদক নয় তার সামন্ত প্রভুর আশু ভোগের জন্য উৎপাদন। এই ভোগের ওপর যদি কখনো একটা উদ্বৃত্ত ঘটে, কেবল তখনই সে উদ্বৃত্তটা বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়, বিনিময়ের মধ্যে আসে। সুতরাং, পণ্য-উৎপাদন নিতান্ত তার শৈশবে। তবু তখনই তার মধ্যে ভ্রূণাবস্থায় নিহিত **সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্য**।

২। **পুঁজিবাদী বিপ্লব** — প্রথমে সরল সমবায় ও হস্তশিল্প কারখানার সাহায্যে শিল্পের রূপান্তর এযাবৎ বিচ্ছিন্ন উৎপাদন-উপায়গুলির বড়ো বড়ো কারখানার মধ্যে কেন্দ্রীভবন। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক উৎপাদন-উপায়ে তাদের রূপান্তর — এ রূপান্তরে বিনিময়ের ধরন মোটের ওপর অপ্রভাবিত। দখলের পূর্বতন রূপগুলিই বলবৎ পুঁজিপতির উদয়। উৎপাদন-উপায়ের মালিক হিশেবে সে উৎপন্নকেও দখল করে এবং তাকে রূপান্তরিত করে পণ্যে উৎপাদন হয়ে দাঁড়ায় একটা **সামাজিক** কাজ। বিনিময় ও দখল থেকেই যায় **ব্যক্তিগত** কাজ, এক একটা ব্যক্তির ব্যাপার, **সামাজিক উৎপন্ন দখল করে ব্যক্তি পুঁজিপতি**। মৌলিক বিরোধ, তা থেকে অন্য সবকিছু বিরোধের উদয়, যার মধ্যে দিয়ে চলেছে আমাদের সমাজ এবং আধুনিক শিল্প যা উদ্ঘাটিত করছে।

ক। উৎপাদনের উপায় থেকে উৎপাদকের বিচ্ছেদ। শ্রমিকদের জন্য আজীবন মজুরি-শ্রমের দণ্ড। **প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে বৈপরীত্য।**

খ। পণ্য-উৎপাদন যে নিয়মগুলির অধীন সেগুলির বর্ধমান আধিপত্য ও ক্রমাধিক কার্যকারিতা। বল্গাহীন প্রতিযোগিতা। **এক একটা ফ্যাক্টরিতে সমাজীকৃত সংগঠন এবং সমগ্রভাবে উৎপাদনের সামাজিক নৈরাজ্যের মধ্যে বিরোধ।**

গ। একদিকে, প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিগত কলওয়ালার পক্ষে যা বাধ্যতামূলক, যন্ত্রের সেই ক্রমোন্নতি এবং তার অনুপূরক হিশেবে শ্রমিকদের নিয়ত বর্ধমান কর্মচ্যুতি। **শিল্পের মজুত বাহিনী।** অন্যদিকে, এটাও প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিটি কলওয়ালার পক্ষে বাধ্যতামূলক, উৎপাদনের সীমাহীন প্রসার। দুদিকেই উৎপাদন-শক্তির অশ্রুতপূর্ব বিকাশ, চাহিদার তুলনায় জোগানের আধিক্য, অতি উৎপাদন, বাজার জ্যাম, প্রতি দশ বছর অন্তর সংকট, পাপ চক্র: এদিকে উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের আধিক্য — ওদিকে কর্মহীন ও জীবিকাহীন শ্রমিকদের আধিক্য। কিন্তু উৎপাদন ও সামাজিক সমৃদ্ধির এই দুটি কারিকা একত্রে সক্রিয় হতে অক্ষম, কারণ উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি উৎপাদন শক্তিকে আটকে রাখে কাজ থেকে এবং উৎপন্নকে আটকে রাখে সঞ্চালন থেকে — যদি না তারা প্রথমে পরিণত হয় পুঁজিতে, কিন্তু এই অতি আধিক্যেই তা অসম্ভব। এ বিরোধ বেড়ে ওঠে এক অদ্ভুত স্তরে। **বিনিময় রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উৎপাদন-পদ্ধতি।** নিজেদেরই সামাজিক উৎপাদন-শক্তিকে আর পরিচালনা করতে অসামর্থ্যের দ্বারা বুর্জোয়ারা অভিযুক্ত।

ঘ। উৎপাদন-শক্তির সামাজিক চরিত্রের অংশিক স্বীকৃতি দিতে পুঁজিপতিরা নিজেরাই বাধ্য হয়। উৎপাদন ও যোগাযোগের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাতে নেয় প্রথমে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, পরে ট্রাস্ট, অতঃপর রাষ্ট্র। অনাবশ্যক শ্রেণী রূপে প্রমাণিত হয় বুর্জোয়ারা। তাদের সামাজিক ক্রিয়ার সবই এখন চলে বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা।

৩। **প্রলেতারীয় বিপ্লব** — বিরোধসমূহের সমাধান। সামাজিক ক্ষমতা দখল করে প্রলেতারিয়েত, এবং তার দ্বারা বুর্জোয়ার হাত থেকে স্খলিত সমাজীকৃত উৎপাদন-উপায়গুলিকে পরিণত করে সাধারণ সম্পত্তিতে এ কাজের ফলে উৎপাদনের উপায়গুলি এতদিন যে পুঁজির চরিত্র ধারণ করেছিল তা থেকে প্রলেতারিয়েত তাদের মুক্ত ক'রে তাদের সমাজীকৃত চরিত্রটার পরিপূর্ণ সক্রিয়তার স্বাধীনতা এনে দেয়। পূর্বনির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনায় সমাজীকৃত উৎপাদন এখন থেকে সম্ভব হয়। উৎপাদনের বিকাশের ফলে তখন থেকে

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব কাল-ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক উৎপাদন থেকে যে পরিমাণে নৈরাজ্য অন্তর্ধান করতে থাকে সেই পরিমাণে মরে যেতে থাকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। মানুষ অবশেষে নিজেদেরই সমাজ-সংগঠনের প্রভু হবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির প্রভু, নিজের প্রভু — মুক্ত।

সার্বজনীন মুক্তির এই কর্মই হল আধুনিক প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রত। ঐতিহাসিক অবস্থাটিকে পুরোপুরি বোঝা এবং সে কারণে এই কর্মের চরিত্র প্রণিধান করা, যে স্মরণীয় কীর্তি প্রলেতারিয়েতের সাধন করার কথা, আজকের নিপীড়িত প্রলেতারীয় শ্রেণীকে, তার শর্ত ও তাৎপর্যের পরিপূর্ণ জ্ঞানদান করা — এই হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্তব্য।

১৮৭৭ সালে এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত
প্যারিসে ফরাসী ভাষায় পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ১৮৮০ সালে, জার্মান ভাষায় জুরিখে ১৮৮২ সালে, বার্লিনে ১৮৯১ সালে এবং ইংরাজি ভাষায় লণ্ডনে ১৮৯২ সালে

১৮৯২ সালের প্রামাণ্য ইংরাজি সংস্করণের পাঠ থেকে বাংলা অনুবাদ

টীকা

(১) এ. এভেলিঙ-এর অনুবাদে ১৮৯২ সালে লণ্ডনে 'সমাজতন্ত্র, ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক' নামে প্রকাশিত এঙ্গেলসের মূল জার্মান সংস্করণ 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এর ইংরেজি সংস্করণের জন্য ফ. এঙ্গেলস ভূমিকাটি লিখে দেন পৃঃ ৩

(২) লাসালীয়রা ও আইজেনাখীয়রা — উনিশ শতকের ষাটের দশক ও সত্তরের গোড়ায় জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের দুটি পার্টি।

লাসালীয়রা — জার্মান পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী ফ. লাসালের পক্ষাবলম্বী ও অনুগামী, ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জার্মান শ্রমিক লীগের সদস্যবৃন্দ। মার্কস ও এঙ্গেলস একাধিক বার ও তীব্রভাবে লাসালপন্থার তত্ত্ব, রণকৌশল ও সাংগঠনিক নীতিকে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের ভেতরে সুবিধাবাদী ধারা হিসেবে সমালোচনা করেছেন। আইজেনাখীয়রা — আইজেনাখে ১৮৬৯ সালের প্রতিষ্ঠা-কংগ্রেসে গঠিত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্যবৃন্দ। আইজেনাখীদের নেতা ছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলসের অনুগামী আ. বেবেল ও ভি. লিবক্নেখত।

১৮৭৫ সালে দুই পার্টিই গোথা কংগ্রেসে ঐক্যবদ্ধ হয় জার্মানির একক সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টিতে, লাসালীয়রা ছিল তার সুবিধাবাদী অংশ। পৃঃ ৭

(৩) Bimetallism (দ্বিধাতু প্রথা) — এতে মুদ্রার ভূমিকা পালন করে দুটি ধাতু — সোনা ও রুপো। পৃঃ ৬

(৪) 'মার্ক' — প্রাচীন জার্মান গ্রামগোষ্ঠী। 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' পুস্তিকার প্রথম জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলস এই নামে প্রাচীন কাল থেকে জার্মান কৃষকদের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিয়েছিলেন। পৃঃ ৭

(৫) অজ্ঞেয়বাদ — (অ্যাগ্নস্টিসিজম) — গ্রীক থেকে, অ — না, গ্নসিস — জ্ঞান। ভাববাদী মতবাদ, তাতে বলা হয় যে বিশ্বকে জানা সম্ভব নয়, মানবিক বোধ সীমিত, অনুভূতির বহির্ভূত কিছুই সে জানতে পারে না। অজ্ঞেয়বাদ বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে: একদল পদার্থগত বিশ্বের অবজেক্টিভ অস্তিত্ব স্বীকার করে কিন্তু তা জানা সম্ভব বলে মানে না, অন্যদল পদার্থগত বিশ্বের অস্তিত্বই অস্বীকার

করে এই যুক্তিতে যে অনুভূতির বাইরে কিছু আছে কিনা তা জানা মানুষের অসাধ্য। পৃঃ ৮

(৬) **স্কুলম্যান** — মধ্য যুগে প্রচলিত একটি ধর্মীয় দার্শনিক ধারার প্রতিনিধি, চূড়ান্ত নিষ্প্রাণ ও বাস্তবতা থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা তাদের বৈশিষ্ট্য, শুধু বন্ধ্যা যুক্তির প্যাঁচ মারফত খৃষ্টীয় গির্জার আপ্তবাক্য প্রমাণে চেষ্টিত। পৃঃ ৮

(৭) **ধর্মতত্ত্ব** (থিয়োলজি — আক্ষরিক গ্রীক অনুবাদে — ঈশ্বর বিষয়ে শিক্ষা) — ধর্মীয় মতবাদ, এতে ধর্মীয় নৈতিকতা, আপ্তবাক্য ও আচারকে একটা প্রণালীতে সমীকৃত ও 'বৈজ্ঞানিক-ভাবে' সুসিদ্ধ করার চেষ্টা হয়। পৃঃ ৮

(৮) **নামবাদী** (নোমিনালিস্ট) — মধ্যযুগীয় এ দর্শনের অনুগামীরা মনে করতেন যে বাস্তবত বিদ্যমান একেকটা বস্তুর উপযোগী নাম দিয়েই কেবল সাধারণ বোধ গড়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় বাস্তববাদীদের বিপরীতে, নামবাদীরা বোধকে বস্তুর আদিরূপ ও সৃজনশীল উৎস রূপে দেখতে অস্বীকার করেন। এইদিক দিয়ে তাঁরা বস্তুকে আদি ও বোধকে গৌণ স্থানে রাখেন। সেই অর্থে নামবাদীরা হলেন মধ্যযুগে বস্তুবাদের প্রথম প্রবক্তা। পৃঃ ৮

(৯) **Homoiomércia** — প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক আনাক্সাগোরাসের মতে, অনুরূপ, নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন পদার্থকণিকার অনন্ত বিভাজন সম্ভব। তাঁর মতে, বিদ্যমান সবকিছুর মূল ভিত্তি হল এই homoiomércia, তার বিভিন্ন যোগাযোগে বস্তু বিভিন্ন আকার নেয়। পৃঃ ৮

(১০) **আস্তিক্যবাদ** (থীইজম) — ধর্মীয়-দার্শনিক এই মতবাদে ব্যক্তিস্বরূপী, বুদ্ধিমান এবং অলৌকিক সত্তা ও সৃষ্টিকর্তা রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর সক্রিয়ভাবে প্রকৃতি ও সমাজের জীবনে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। পৃঃ ১০

(১১) **Deism** — ধর্মীয়-দার্শনিক মতবাদ, এতে বিশ্বের ব্যক্তিস্বহীন, বুদ্ধিমান, প্রাথমিক হেতু হিসেবে ঈশ্বরকে মানা হয় বটে কিন্তু প্রকৃতি ও সমাজের জীবনে তার হস্তক্ষেপ স্বীকার করা হয় না। পৃঃ ১০

(১২) ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস — পবিত্র পরিবার, বা বিচারমূলক সমালোচনার সমালোচনা। ব্রুনো বাউয়ের কোম্পানির বিরুদ্ধে। পৃঃ ১০

(১৩) ১৮৫১ সালে মে-অক্টোবরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য-শিল্পের প্রথম বিশ্ব প্রদর্শনীর কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১১

(১৪) **ব্যাপটিস্ট** — খৃষ্টধর্মের একটি বহুলপ্রচলিত সম্প্রদায়ের অনুগামী। পৃঃ ১১

(১৫) **'স্যালভেশন আর্মি'** — ১৮৬৫ সালে ধর্মপ্রচারক উইলিয়ম বুথ কর্তৃক ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয়-লোকহিতৈষী সংগঠন, পরে অন্যান্য দেশেও তার ক্রিয়াকলাপ প্রসারিত হয় (নামকরণ হয় ১৮৮০ সালে, সামরিক কায়দায় তার পুনর্গঠনের পর)। বুর্জোয়াদের কাছ থেকে রীতিমতো সমর্থন পেয়ে এ সংগঠন ব্যাপক ধর্মীয় প্রচার চালায়, শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে মেহনতীদের সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একসারি দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে। তার কোনো কোনো প্রচারক সামাজিক নাম নিয়ে গলাবাজি করত, ধনীদের স্বার্থপরতার লোক-দেখানি নিন্দা করত। পৃঃ ১২

(১৬) **অধ্যাত্মবাদ** (স্পিরিচুয়ালিজম) (লাতিন spiritus — আত্মা থেকে) — ভাববাদী মতবাদ, তাতে দাবি করা হয় মন মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল নয়, তার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, আত্মা চিরন্তন, বিশ্বের সারাৎসার আধ্যাত্মিক। পৃঃ ১৫

(১৭) বৃটিশ বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ্যায় **'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব'** নাম দেওয়া হয় ১৬৮৮ সালের রাষ্ট্রীয় ওলট পালটকে, যার ফলে স্টুয়ার্ট বংশ সিংহাসনচ্যুত হয় এবং ভূস্বামী অভিজাত ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে আপসের ভিত্তিতে উইলিয়ম অরানজের নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃঃ ১৮

(১৮) লাল-শাদা গোলাপের যুদ্ধ (১৪৫৫—১৪৮৫) — সিংহাসনের দাবিদার দুই সামন্ত বংশের মধ্যে যুদ্ধ. ইয়র্কদের প্রতীকচিহ্ন ছিল শাদা গোলাপ, ল্যাংকাস্টারদের চিহ্ন লাল গোলাপ। ইয়র্কদের পাশে জোট বাঁধে অর্থনীতির দিক দিয়ে বেশি বিকশিত দক্ষিণের বড়ো বড়ো সামন্তের একাংশ, নাইট সম্প্রদায় ও শহরের লোক, ল্যাংকাস্টারদের সমর্থন করে উত্তরের [illegible] সামন্ত অভিজাতরা। যুদ্ধের ফলে বনেদী সামন্ত বংশেরা প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয় ও তার সমাপ্তি হয় নতুন টুডর বংশের ক্ষমতা লাভে, যা ইংলণ্ডে একচ্ছত্র স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। পৃঃ ১৯

(১৯) কার্তেজিয়ানবাদ — দেকার্তের মতবাদ, ১৭-১৮শ শতকে তাঁর অনুগামীরা বিকশিত করে দর্শন ও প্রকৃতিবিদ্যার একটি ধারা। দেকার্তের লাতিনীকৃত নাম Cartesius থেকে এই নামকরণ। পৃঃ ২০

(২০) এনসাইক্লোপিডিস্ট (বিশ্বকোষবাদী) — ১৮শ শতকের একদল ফরাসী জ্ঞানপ্রচারক দার্শনিক, প্রকৃতি পরীক্ষক, প্রবন্ধকর্তা 'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers' (1751-1780) প্রকাশের জন্য জোট বাঁধেন। এর সম্পাদক ছিলেন দেনি দিদেরো। পল আঁরি হলবাখ, ক্লদ আদ্রিয়াঁ হেলভেতিয়স, ভলতেয়ার প্রভৃতি বিশ্বকোষ প্রকাশে সক্রিয় অংশ নেন।

এনসাইক্লোপিডিস্টদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা নেন বস্তুবাদীরা, সক্রিয়ভাবে তাঁরা ভাববাদী দর্শনের বিরোধিতা করেন।

বিশ্বকোষ লেখকেরা যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি রাজনীতিতেও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন কিন্তু সামন্ততন্ত্র ও গির্জার স্বেচ্ছাচারের প্রতি বিরূপ মনোভাব ও মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিজ্‌মের প্রতি বিদ্বেষ তাঁদের সম্মিলিত করে।

ফ্রান্সে ১৮শ শতকের শেষে বুর্জোয়া বিপ্লবের ভাবাদর্শীয় প্রস্তুতিতে এনসাইক্লোপিডিস্টরা নির্ধারক ভূমিকা নেন। পৃঃ ২১

(২১) ১৭৮৯ সালে সংবিধান সভায় গৃহীত 'মানুষ ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণাপত্র'-র কথা বলছেন এঙ্গেলস, নতুন বুর্জোয়া ব্যবস্থার রাজনৈতিক নীতিগুলি লিপিবদ্ধ হয় তাতে। ঘোষণাপত্রটি ১৭৯১ সালের ফরাসী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে রচিত হয় জ্যাকোবিনদের 'মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার ঘোষণাপত্র' ১৭৯৩ সালে। পৃঃ ২১

(২২) **Code Civil** (দেওয়ানী আইন-সংহিতা) — ১৮০৪-১৮১০ সালে প্রথম নেপোলিয়নের আমলে রচিত পাঁচটি আইন সংহিতার একটি (এই জন্য দেওয়ানী আইন সংহিতাটি কোড নেপোলিয়ন বলেও পরিচিত) বুর্জোয়া অধিকারের একটি সাধারণ প্রণালীবদ্ধন হয়েছে এতে। ১৮০৪ সালে গৃহীত দেওয়ানী আইন সংহিতাটিকে এঙ্গেলস বলেছিলেন বুর্জোয়া সমাজের আইনের একটি ক্লাসিকাল সার-সংকলন। পৃঃ ২১

(২৩) ১৮৩১ সালে বৃটিশ কমন্স সভায় গৃহীত ও ১৮৩২ সালের জুন মাসে লর্ড সভায় চূড়ান্ত রূপে অনুমোদিত নির্বাচন আইন সংস্কারের বিলটির কথা বলা হচ্ছে। এ সংস্কার চালিত হয় ভূমিজীবী ও অর্থপতি অভিজাতদের রাজনৈতিক একাধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং পার্লামেন্টে শিল্পজীবী বুর্জোয়ার প্রবেশপথ খুলে দেয়। সংস্কারের জন্য সংগ্রামে প্রধান শক্তি ছিল প্রলেতারিয়েত ও পেটিবুর্জোয়ারা, উদারনৈতিক বুর্জোয়া তাদের প্রতি প্রবঞ্চনা করে, ভোটাধিকার তারা পায় না। পৃঃ ২৩

(২৪) **শস্য আইন** - আমদানি করা শস্যের ওপর চড়া শুল্কের আইন, ভূস্বামী ল্যান্ডলর্ডদের স্বার্থে ১৮১৫ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। শস্য আইন জনগণের গরিব অংশের অবস্থা দুঃসহ করে, শিল্প বুর্জোয়ার কাছেও তা লাভজনক ছিল না, কেননা এতে শ্রমশক্তি দুর্মূল্য হয়ে ওঠে, আভ্যন্তরীণ বাজারের পরিসর কমে, বহির্বাণিজ্য বিকাশে ব্যাঘাত হয়। ৩০-এর দশকের শেষে কবডেন ও ব্রাইটের নেতৃত্বে বৃটিশ বুর্জোয়ারা শস্য আইনের বিরুদ্ধে লীগ গঠন করে শস্য আইন নাকচের জন্য লীগ কয়েক বছর ধরে সংগ্রাম চালায় এবং ১৮৪৬ সালে শস্য আইন বাতিল হয়ে যায়। পৃঃ ২৩

(২৫) ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, গণ আন্দোলনের চাপে বৃটিশ পার্লামেন্ট ১৮২৪ সালে তা তুলে নেবার আইন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু ১৮২৫ সালে শ্রমিক কোআলিশন সম্পর্কে একটি আইন গ্রহণ করে পার্লামেন্ট, তাতে ট্রেড ইউনিয়ন নিষেধ বাতিল বলে অনুমোদিত হলেও তার ক্রিয়াকলাপ প্রচণ্ড সীমাবদ্ধ করা হয়। যেমন ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকদের যোগদানের জন্য এবং ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ প্রচারকে ধরা হত 'বাধাকরণ', 'জবরদস্তি' বলে, ফৌজদারী অপরাধের মতো তার শাস্তি হত। পৃঃ ২৪

(২৬) **জনগণের চার্টার** — চার্টিস্টদের দাবি সম্বলিত জনগণের চার্টার পার্লামেন্টে গ্রহণের জন্য আইনের খসড়া হিশেবে প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালের ৮ই মে, তাতে ছিল ছয়টি ধারা, সার্বজনীন ভোটাধিকার (২১ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের জন্য), পার্লামেন্টে প্রতি বছর নির্বাচন, গোপন ব্যালট, নির্বাচনী এলাকার সমতা সাধন, পার্লামেন্টে নির্বাচনপ্রার্থীর জন্য সম্পত্তিগত শর্ত নাকচ, প্রতিনিধিদের বেতন দান। জনগণের চার্টার গ্রহণের দাবি করে চার্টিস্টরা পার্লামেন্টে যে তিনটি আর্জি পেশ করে, ১৮৩৯, ১৮৪২ ও ১৮৪৯ সালে তারা তা প্রত্যাহার করে নেয় পৃঃ ২৪

(২৭) **শস্য আইন বিরোধী লীগ** - ১৮৩৮ সালে বৃটিশ শিল্প বুর্জোয়াদের এই সংগঠনটি স্থাপন করেন ম্যাঞ্চেস্টারের কলওয়ালা কবডেন ও ব্রাইট। পরিপূর্ণ অবাধ বাণিজ্যের দাবি করে লীগ শ্রমিকদের বেতন হ্রাস ও ভূমিজীবী অভিজাতদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে শস্য আইন নাকচের জন্য চেষ্টা করে। (২৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য) ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লীগ শ্রমিক জনগণকে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু ওতদিনে অগ্রণী বৃটিশ শ্রমিকেরা স্বাধীন, রাজনৈতিক ভাবে রূপায়িত শ্রমিক আন্দোলনের পথ নেয় (চার্টিস্ট)। শস্য আইন নাকচ হয়ে যাবার পর লীগ উঠে যায়। পৃঃ ২৪

(২৮) জোনাথান ভাই — স্বাধীনতার জন্য ইংলন্ডের উত্তর আমেরিকান উপনিবেশের যুদ্ধের সময় (১৭৭৫ ১৭৮৩) বৃটিশদের দেওয়া উত্তর আমেরিকানদের ব্যঙ্গাত্মক নাম। পৃঃ ২৪

(২৯) রিভাইভ্যালিজ্‌ম্ (পুনঃপ্রবর্তনবাদ) - ১৮শ শতকের প্রথমার্ধে ইংলন্ডে উদিত ও উত্তর আমেরিকায় প্রচারিত প্রটেস্টান্ট ধর্মের একটি ধারা এর অনুগামীরা ধর্মীয় প্রচার ও ঈশ্বরবিশ্বাসীদের নতুন নতুন সংঘ স্থাপন করে খৃষ্টধর্মের প্রভাব সংহত ও প্রসারিত করার চেষ্টা করত। পৃঃ ২৪

(৩০) ১৮৬৭ সালে ডের্বি-ডিজরেলি'র রক্ষণশীল সরকারের পার্লামেন্টী সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে। ১৮৬৭ সালের সংস্কারের ফলে ইংলন্ডে নির্বাচকদের সংখ্যা দুগুণের বেশি বাড়ে দক্ষ শ্রমিকদের একাংশও ভোটাধিকার পায় পৃঃ ২৬

(৩১) হুইগ ও টোরি ১৭শ শতকের ৭০-৮০-এর দশকে গঠিত বৃটেনের দুটি রাজনৈতিক পার্টি। হুইগরা অর্থপতি মহল ও বাণিজ্যজীবী বুর্জোয়ারা ও জমি

বুর্জোয়া হয়ে ওঠা অভিজাতদের একাংশের স্বার্থ প্রকাশ করত। হুইগদের থেকেই উদারনৈতিক পার্টির সূত্রপাত। টোরিরা ছিল বৃহৎ ভূস্বামী ও বৃটিশ চার্চের ঊর্ধ্বতন যাজকদের প্রতিনিধি, পরে তা রক্ষণশীল দলের সূচনা করে। হুইগ ও টোরি পার্টি পালা করে ক্ষমতায় এসেছে। পৃঃ ২৭

(৩২) গোপন ব্যালট প্রবর্তিত হয় ১৭৭২ সালে। পৃঃ ২৭

(৩৩) ক্যাথিডার-সোশ্যালিজম — ১৯শ শতকের ৭০-৯০-এর দশকের একটি বুর্জোয়া ভাবাদর্শীয় ধারা, এর প্রবক্তারা ছিলেন প্রধানত জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা; বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ (জার্মানিতে Katheder — এই থেকেই নামকরণ) থেকে এঁরা বুর্জোয়া সংস্কারবাদের প্রচার করতেন তাকে সমাজতন্ত্র বলে চালিয়ে। ক্যাথিডার-সোশ্যালিজমের প্রতিনিধিরা বলতেন যে রাষ্ট্র হল শ্রেণী-ঊর্ধ্ব প্রতিষ্ঠান, বৈরী শ্রেণীদের মধ্যে মিল ঘটাতে এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে হাত না দিয়ে 'সমাজতন্ত্র' প্রবর্তন করতে তা সক্ষম। ক্যাথিডার-সোশ্যালিজমের কর্মসূচি পর্যবসিত হয় রোগ ও দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বীমা ব্যবস্থার সংগঠন, ফ্যাক্টরি আইনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণাদিতে এবং তার উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণী সংগ্রাম থেকে শ্রমিকদের বিচ্যুত করা। পৃঃ ২৭

(৩৪) রিচুয়ালিজম্ (অধিকতর প্রচলিত নাম পিউজিইজম্) — ১৯শ শতকের ৩০-এর দশকে উদিত বৃটিশ গির্জার অভ্যন্তরস্থ একটি ধারা; এই মতাবলম্বীরা বৃটিশ গির্জায় ক্যাথলিক আচার-অনুষ্ঠান (এই থেকেই নামকরণ) ও তার কতকগুলি আপ্তবাক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করেন।

'স্যালভেশন আর্মি' — ১৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৮

(৩৫) বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে ল. ব্রেন্তানোর লেখা ও বক্তৃতার কথা বলছেন এঙ্গেলস। এতে তিনি সর্বোপায়ে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নকে শ্রমিকদের আদর্শ সংগঠন বলে দেখাবার চেষ্টা করেন, তাতে নাকি পুঁজিবাদের পরিস্থিতিতেই শ্রমিকদের অবস্থার আমূল উন্নয়ন ও পুঁজিবাদী শোষণ থেকে পরিত্রাণের সুযোগ মেলে। ব্রেন্তানো ও অন্যান্য ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্টদের বক্তব্য অনুসারে, সুসংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক পার্টি অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। 'ব্রেন্তানো contra মার্কস' রচনায় এঙ্গেলস এরূপ উক্তির মিথ্যা চরিত্র ও শ্রেণীমর্ম খুলে দেখান। পৃঃ ২৯

(৩৬) ইস্ট এন্ড — লন্ডনের পূর্বাংশ, শ্রমিক পাড়া। পৃঃ ৩০

(৩৭) সোশ্যালিস্টদের বিরুদ্ধে জরুরী আইনের কথা বলা হচ্ছে, জার্মানিতে এটি জারী হয় ১৮৭৮ সালের ২১শে অক্টোবর। ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের চাপে আইনটি তুলে নেওয়া হয় ১৮৯০ সালের ১লা অক্টোবর। পৃঃ ৩২

(৩৮) রুসোর তত্ত্ব অনুসারে, মানুষ প্রথমে ছিল প্রাকৃতিক অবস্থায়, সবাই সেখানে সমান। ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দেওয়া, সম্পত্তিভিত্তিক অসাম্য বিকশিত হওয়ার ফলেই প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে লোকে নাগরিক (সভ্য) অবস্থায় চলে আসে, গঠিত হয় সামাজিক চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র। কিন্তু রাজনৈতিক অসাম্য আরো বেড়ে ওঠার ফলে লঙ্ঘিত হয় সামাজিক চুক্তি, দেখা দেয় অধিকারহীনতার একটা নতুন অবস্থা। এই শেষোক্ত জিনিসটা দূরীভূত করার কথা হল একটা নতুন সামাজিক চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব রাষ্ট্রের। পৃঃ ৩২

(৩৯) অ্যানাব্যাপটিস্ট (পুনর্দীক্ষিত) — ১৬শ শতকে জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে উদিত একটি ধর্মসম্প্রদায়ের অনুগামী। ১৫২৪-১৫২৫ সালের কৃষকযুদ্ধে অ্যানাব্যাপটিস্টরা, যাদের বেশির ভাগই ছিল কৃষক, হস্তশিল্পী, ছোটো দোকানদার, তারা যোগ দেয় আন্দোলনে টমাস মুনৎসারের নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বাধিক বিপ্লবী অংশটার সঙ্গে। পৃঃ ৩৩

(৪০) এঙ্গেলস 'সাচ্চা লেভেলার' ('সাচ্চা সমান সমানওয়ালা') বা 'ডিগার' ('খনক', — ১৭শ শতকের বৃটিশ বুর্জোয়া বিপ্লবের পর্বে চরম বামপন্থী ধারার প্রতিনিধিদের কথা বলছেন। 'ডিগার'রা ছিল গ্রাম ও শহরের দরিদ্রতম স্তরের স্বার্থপ্রকাশক, জমিতে ব্যক্তিমালিকানা বিলোপের দাবি করে তারা, আদিম সাম্যবাদী কমিউনিজমের ধারণা প্রচার করে এবং সরকারী জমির যৌথ কর্ষণ মারফত তা ব্যবহারিক ভাবে রূপায়িত করতে চায়। পৃঃ ৩৩

(৪১) টমাস মোর ('ইউটোপিয়া', ১৫১৬ সালে প্রকাশিত) ও টমাস ক্যাম্পানেল্লা ('সূর্যের নগর', ১৬২৩ সালে প্রকাশিত) — ইউটোপীয় কমিউনিজমের এই প্রবক্তাদের রচনার কথা বলছেন এঙ্গেলস। পৃঃ ৩৩

(৪২) সন্ত্রাসের পর্ব — জ্যাকবিনদের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের পর্ব (১৭৯৩ সালের জুন থেকে ১৭৯৪ সালের জুলাই), যখন জিরন্ডপন্থী ও রাজতন্ত্রীদের প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জ্যাকবিনরা বৈপ্লবিক সন্ত্রাস প্রয়োগ করে।

ডিরেক্টরেট (পাঁচজন পরিচালক নিয়ে গঠিত, তাদের ভেতর একজন প্রতি বছর নির্বাচনীয়) ১৭৯৪ সালে জ্যাকবিন বৈপ্লবিক একনায়কত্বের পতনের পর ১৭৯৫ সালের সংবিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সের কর্মনির্বাহী ক্ষমতার পরিচালক সংস্থা। টিকে থাকে ১৭৯৯ সালের বোনাপার্টীয় রাষ্ট্রীয় কুদেতা পর্যন্ত, গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের পোষকতা করত ও সমর্থন করত বৃহৎ বুর্জোয়ার স্বার্থ। পৃঃ ৩৪

(৪৩) আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বিপ্লবের নীতি, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩৫

(৪৪) নিউ ল্যানার্ক (New Lanark) — স্কটল্যান্ডের ল্যানার্ক শহরের অদূরে অল্প জনবসতি নিয়ে ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সুতাকল। পৃঃ ৩৫

(৪৫) **মিত্র ফৌজ** — ষষ্ঠ ফরাসী বিরোধী জোটভুক্ত দেশের (রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইংলন্ড, প্রুশিয়া ইত্যাদি) ফৌজ প্যারিসে প্রবেশ করে ১৮১৪ সালের ৩১শে মার্চ। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের পতন হয়, আর নেপোলিয়ন নিজে পদত্যাগের পর এলবা দ্বীপে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন। ফ্রান্সে ঘটল বুর্বোঁ রাজতন্ত্রের প্রথম পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

একশ দিন — ১৮১৫ সালের ২০শে মার্চ এলবার নির্বাসন থেকে নেপোলিয়নের প্যারিসে প্রত্যাবর্তন ও সেই বছরেই ২২শে জুনে ওয়াটার্লু যুদ্ধে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় বার সিংহাসনচ্যুতি পর্যন্ত স্বল্পকালীন সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পর্ব। পৃঃ ৩৮

(৪৬) **ওয়াটার্লু** — (বেলজিয়ম) ১৮১৫ সালের ১৮ই জুন এখানে ওয়েলিংটনের সেনাপত্যে বৃটিশ-ওলন্দাজ ফৌজ এবং ব্লুখারের সেনাপত্যে প্রুশীয় ফৌজের কাছে বিধ্বস্ত হয় নেপোলিয়নীয় বাহিনী। ১৮১৫ সালের অভিযানে এই সংঘাতটাই নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছিল, সপ্তম ফরাসী-বিরোধী জোটের (ইংলন্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, সুইডেন, স্পেন ইত্যাদি) বিজয় ও নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের পতন এতে পূর্বনির্ধারিত হয়ে যায়। পৃঃ ৩৮

(৪৭) ১৮১৫ সালের জানুয়ারিতে গ্লাস্‌গো'তে বড়ো একটা জনসভায় কারখানার বালক ও বয়স্ক শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য ওয়েন কয়েকটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। ওয়েনের উদ্যোগে ১৮১৫ সালে পার্লামেন্টে যে বিল পেশ করা হয়, তা আইন হিশেবে গৃহীত হয় কেবল ১৮১৯ সালের জুলাইয়ে, তাও ভয়ানক কাট-ছাঁট করে। সুতাকলের শ্রম-নিয়ন্ত্রক আইনে ৯ বৎসরের কম বালক-বালিকাদের খাটুনি নিষিদ্ধ হয়, ১৮ বছরের কম বয়স্ক লোকেদের শ্রমদিন সীমিত হয় ১২ ঘণ্টায়, এবং সমস্ত শ্রমিকদের জন্য প্রাতরাশ ও আহারের জন্য মোট দেড় ঘণ্টার জন্য দুটি বিরামের ব্যবস্থা হয়। পৃঃ ৪০

(৪৮) ১৮৩৩ সালের অক্টোবরে লন্ডনে ওয়েনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় সমিতিগুলির কংগ্রেস এখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রেট বৃটেন ও আয়র্ল্যান্ডের সংযুক্ত জাতীয় উৎপাদনী ইউনিয়ন, ইউনিয়নের নিয়মাবলি গৃহীত হয় ১৮৩৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ওয়েনের উদ্দেশ্য ছিল, এ ইউনিয়ন উৎপাদনের পরিচালনা স্বহস্তে নেবে ও শান্তিপূর্ণ পথে সমাজের পুনর্গঠন ঘটাবে। অতি দ্রুতই এই ইউটোপীয় পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখে ইউনিয়ন ভেঙে যায় ১৮৩৪ সালের অগস্টে। পৃঃ ৪০

(৪৯) শ্রমোৎপন্নের ন্যায্য বিনিময়ের জন্য ইংলন্ডের বিভিন্ন শহরের শ্রমিকদের সমবায় সংগঠন কর্তৃক স্থাপিত বাজারের (Equitable Labour Exchange Bazaars) কথা বলা হচ্ছে; রবার্ট ওয়েন এ রূপ বাজার প্রথম স্থাপন করেন লন্ডনে ১৮৩২ সালের সেপ্টেম্বরে, ১৮৩৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তা টিকে থাকে। পৃঃ ৪৩

(৫০) প্রুধোঁর বিনিময় ব্যাঙ্ক গঠনের চেষ্টা হয় ১৮৪৮- ১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময়, তাঁর Banque du peuple (জনগণের ব্যাঙ্ক) প্যারিসে স্থাপিত হয় ১৮৪৯ সালের ৩১শে জানুয়ারি। ব্যাঙ্ক টিকে থাকে কেবল দুই মাস তাও কাগজ-পত্রে: নিয়মিত কাজ চলা শুরু করার আগেই তা ভেঙে যায়, বন্ধ করে দেওয়া হয় এপ্রিলের গোড়ায়। পৃঃ ৪৩

(৫১) বিজ্ঞানের বিকাশে আলেকজেন্ড্রীয় যুগটা খৃঃ পূঃ ৩য় শতক থেকে ৭ম খৃঃ নিয়ে। এ নামকরণ হয় মিশরের আলেকজেন্ড্রিয়া নগর থেকে, এটি ছিল তখনকার একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক কারবার ও দেওয়া নেওয়ার কেন্দ্র। আলেকজেন্ড্রীয় যুগে একসারি বিজ্ঞান গুরুত্বলাভ করে, যথা গণিত ও বলবিদ্যা (ইউক্লিড ও আর্কিমিডিস), ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীরস্থান শারীরবৃত্ত ইত্যাদি। পৃঃ ৪৬

(৫২) এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ১৪৯২ সালে ক্রিস্টফার কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা এবং ১৪৯৮ সালে ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক ভারতে পৌঁছবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার। পৃঃ ৬০

(৫৩) ১৭শ ও ১৮শ শতকে ভারতে ও আমেরিকায় আধিপত্য স্থাপন ও ঔপনিবেশিক বাজার দখলের জন্য বড়ো বড়ো ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে একসারি যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র ছিল ইংলন্ড ও হল্যান্ড (১৬৫২-১৬৫৪, ১৬৬৪—১৬৬৭, ও ১৬৭২—১৬৭৪ সালের ইঙ্গ-ওলন্দাজ যুদ্ধগুলি হল টিপিকাল বাণিজ্য যুদ্ধ)। পরে নির্ধারক সংগ্রাম বাধে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে। এই সমস্ত যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসে ইংলন্ড, আঠারো শতকের শেষাশেষি তার হাতে কেন্দ্রীভূত হয় প্রায় সমস্ত বিশ্ব বাণিজ্য। পৃঃ ৬০

(৫৪) কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এঙ্গেলস। পৃঃ ৬১

(৫৫) ক. মার্কস 'পুঁজি' ১ম খণ্ড, ১৩শ অধ্যায়, যন্ত্র ও বৃহৎ শিল্প। পৃঃ ৬১

(৫৬) **Seehandlung** (সামুদ্রিক বাণিজ্য) প্রুশিয়ায় ১৭৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান; এটি গুরুত্বপূর্ণ নানা রাষ্ট্রীয় বিশেষাধিকার ভোগ করত, মোটা ঋণ দিত রাষ্ট্রকে, কার্যত তা রাষ্ট্রের ব্যাঙ্কার ও ফিনান্সের ব্যাপারে তার এজেন্টের কাজ করত ১৯০৪ সালে তা সরকারীভাবে প্রুশীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। পৃঃ ৬৬

(৫৭) 'মুক্ত জনরাষ্ট্র' ছিল ৭০-এর দশকে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কর্মসূচি-ভিত্তিক দাবি ও প্রচলিত ধ্বনি। পৃঃ ৬৯

নামের সূচি

প

ফ

ব

ভ

ম

র

ল

Цена 20 коп.

Ф. ЭНГЕЛЬС

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИЗМА
ОТ УТОПИИ К НАУКЕ.

на языке бенгали